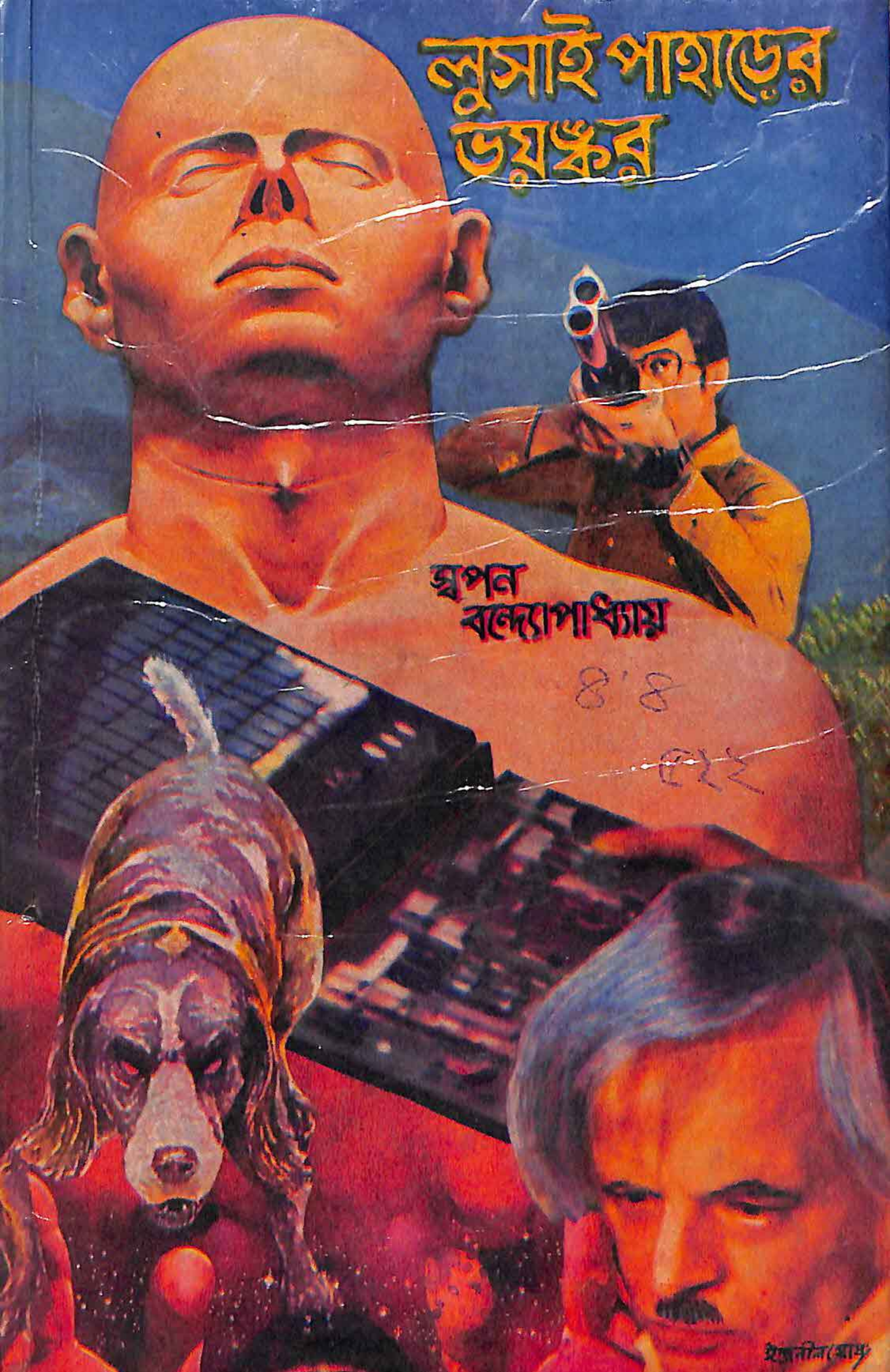


লুসাই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান তাপস স্যার সত্যপ্রকাশের রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার

লুসাই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বিলাস হাজরা
মডার্ন প্রিন্টার্স
৬১/বি, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য ৭.০০

আমার পরম শ্রদ্ধেয়
সাহিত্যিক-সম্পাদক
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
করকমলে।

—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পরিবেশনায় এই লেখকের অন্যান্য বই

- ☐ রহস্যভেদী মেঘনাদ
- ☐ ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য
- ☐ চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা

প্রকাশকের নিবেদন

কিশোর সাহিত্যের বর্তমান. লেখকদের মধ্যে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্প সময়েই পাঠকদের মনে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন জাতের লেখায় তিনি পারদর্শী।

কল্পবিজ্ঞান রচনায় তাঁর অতি জনপ্রিয় চরিত্র স্যার সত্যপ্রকাশ।

বিজ্ঞান সুরভিত রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের রুদ্ধশ্বাস আকর্ষণ, সর্বোপরি মানব-বোধের উত্তরণ—তাঁর এইসব কাহিনীগুলিতে বৈশিষ্ট্য এনেছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞান অ্যাডভেঞ্চার দুটি ইতিপূর্বেই কিশোর ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। এখন একই বইয়ের মধ্যে দু-দুটি উপন্যাস ভরে পাঠকদের কাছে হাজির করা হল। যাদের জন্য এ আয়োজন তাদের খুশি করতে পারলেই আমরা সার্থক।

সূচীপত্র

লুসাই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর

॥ এক ॥
[আশ্চর্য চিঠি]

এরোড্রামের লাউঞ্জে পা দিতেই স্যার সত্যপ্রকাশের মুখোমুখি। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ এক মুখ হেসে এগিয়ে এসে বললেন,—ঠিক সময়েই এসে পড়েছ স্বপন, আর ঘণ্টাখানেক বাদেই ফ্লাইট!

বেশ কিছুদিন বাদে মানুষটার সঙ্গে দেখা। কিন্তু ওঁর চেহারা দেখলাম একটুও বদলায়নি। এক মাথা উস্কোখুস্কো চুল, না ছাঁটা গোঁফ, নাকের ওপর সেকেলে প্যাটার্নের চশমা, পরনে ঝলঝলে পোশাক। এঁর পরিচয় না জানলে বাইরে থেকে দেখে কে বুঝবে মানুষটা একজন এত বড় বিজ্ঞান গবেষক! নিজের জীবনের সব কিছুর বিনিময়েও একটার পর একটা বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং তথ্য অনুসন্ধান করে জীবনটা অতিবাহিত করে চলেছেন। আর এমন লোক যে একটু খেয়ালী, খ্যাপাটে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন,—আমি কিন্তু তোমার কোন মতামতের অপেক্ষা না করেই আগে থেকে প্লেনের দুটো সীট 'বুক' করে রেখেছি। অন্ততঃ দিন পনের সময় হাতে নিয়ে এসেছো তো?

সত্যি বলতে কি, আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের এ অভিযান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না।

কয়েকদিন আগে স্যার সত্যপ্রকাশের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠি পাঠিয়েছেন সুদূর রাজস্থানের রতনপুরে তাঁর নিজস্ব আবাস থেকে।

চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। তাতে শুধু লেখা:

"স্বপন,

আগামী ৩০শে মে সকাল ঠিক ৭টা নাগাদ দমদম এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে তোমার অপেক্ষায় থাকবো। চিঠিতে বেশী কিছু লেখা সম্ভব নয়। এখন শুধু এটুকু বলতে পারি চিত্তাকর্ষক এবং রোমাঞ্চকর এক অভিযানে যাত্রা করছি আমি। সঙ্গী হতে চাইলে হাতে অন্ততঃ দিন পনেরর জন্য সময় এবং অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে আসবে।

শুভেচ্ছাসহ

তোমাদের
স্যার সত্যপ্রকাশ

চিঠি পড়েই লাফিয়ে উঠেছি। একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল।

রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আমার চিরকালের অনুরাগ। তাই এ ব্যাপারে ডাক পেলে সাড়া দিতে দেরী করি না।

বিশেষতঃ সেইজন যদি স্যার সত্যপ্রকাশ হন তবে তো কথাই নেই।

স্যার সত্যপ্রকাশ সেটা আমার সম্পর্কে ভাল মতই জানেন, কিন্তু আগে ওঁর ব্যাপারটা আমার তো জানা দরকার।

বললাম,—আপনার চিঠি পেয়ে হুম করে তো চলে এলাম, কিন্তু কি ব্যাপার, কোথায় যাবেন, কিছুই তো লেখেন নি।

রহস্যময় হাসি হেসে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন,—সবই জানতে পারবে। আগে চল, লাগেজ ভ্যানে দুজনের মালপত্তরগুলো তুলে দিয়ে আসি।

মালপত্তর অবশ্য নামেই, আমাদের দুজনের সঙ্গেই থাকার মধ্যে আছে একটা করে সুটকেশ। বাইরে কোথাও যাবার সময় মালপত্তরের বোঝা যত কমে ততই ভাল।

কাজ সেরে আমরা এলাম চায়ের ষ্টলে। এখনও হাতে কিছুটা সময় আছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন,—প্রফেসর কৃষ্ণ-বল্লভের নাম শুনেছ স্বপন ?

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ। নামটা মনের মধ্যে হাতড়াতে থাকি। কোথায় যেন শুনেছি কিন্তু এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। অকপটে জবাব দিই।

—সে কথায় পরে আসছি, আগে মানুষটার পরিচয় দিই।

স্যার সত্যপ্রকাশ শুরু করলেন ঃ

—প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ এককালে আমারই সঙ্গে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করতেন। খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। ইলেক্‌ট্রনিক্‌সের ওপর ওঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা এককালে শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও আলোড়ন তুলেছিল। প্রফেসরের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু অত্যধিক দাম্ভিকতা ও বদমেজাজ সকলের কাছে দিনে দিনে অপ্রিয় করে তুলেছিল প্রফেসরকে। শুধু তাই নয়, নিজে তিনি যা সঠিক মনে করতেন, যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবেও অন্য কেউ তাঁর সে মতকে ত্রুটিযুক্ত প্রতিপন্ন করতে চাইতেন, প্রফেসর তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর যে-কোন রকম ক্ষতি করতেও দ্বিধা করতেন না।

ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল বিশ বছর আগে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দার্জিলিং অধিবেশনের এক সন্ধ্যায় প্রফেসর কৃষ্ণ-বল্লভের যন্ত্রমানব বা রোবট সম্পর্কিত এক মৌলিক আলোচনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটি আবিষ্কার করলেন প্রখ্যাত জাপানী বিজ্ঞানী ডঃ তাকাশি কাওয়াতা। দীর্ঘক্ষণ তর্কযুদ্ধ চললো দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে। তারপর সভার সদস্যরা ডঃ কাওয়াতার তথ্য এবং সিদ্ধান্তকেই নির্ভুল বলে মেনে নিলেন।

আর তার পরদিনই ঘটলো দুর্ঘটনাটা। ডঃ কাওয়াতা প্রতিদিনের মতো সেদিনও সন্ধ্যেবেলায় দার্জিলিং-এর পাহাড়ী উপত্যকায় তাঁর ছোট্ট টু-সীটার গাড়ীটা নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা জীপ এসে সজোরে ধাক্কা দিল পেছন থেকে। ছিটকে পড়ে গেলেন প্রখ্যাত জাপানী বিজ্ঞানী ডঃ তাকাশি কাওয়াতা

হাজার ফুট গভীর খাদের তলায়।

পুলিস এ ব্যাপারে তদন্ত করে আসল যে অপরাধীর হদিস করেছিল, তিনি প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ। এই ভাবেই প্রফেসর ঁ ছ বিরুদ্ধ মতবাদীকে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভকে আর পাওয়া গেল না। তখন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ—সেই গত বিশ বছর আগে।

স্যার সত্যপ্রকাশ থামতেই আমি জিগ্যেস করলাম,—কিন্তু আমাদের আজকের যাত্রার সঙ্গে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক সবটাই।—স্যার সত্যপ্রকাশ আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন: বহু বছর বাদে পনের দিন আগে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের একটা চিঠি পেয়েই আজ আমরা যাচ্ছি ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে।

কি বলছেন আপনি?—এবার আমি চমকে না উঠে পারি না।

—এতে অবাক হবার কিছু নেই স্বপন। বিশ বছর আগে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ আমার সহকর্মী ছিলেন। সেই দাবীতে চিঠি তিনি আমায় লিখতেই পারেন। এতদিন হয়তো অসুবিধা ছিল, তাই লেখেন নি। তা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহলও কম নেই।

এবার হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। খবরটা কাগজে দেখেছিলাম—আমাদের দেশের এক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ অমলেশ মজুমদার গত একমাস হলো রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ। এ ব্যাপারে কোন হদিস পাওয়া যায় নি। অমলেশবাবুর স্ত্রী লীলাদেবী বলেছেন, তাঁর স্বামী নাকি নিরুদ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে মাসাধিক কাল আগে হঠাৎ একটা চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে গেছেন। চিঠির কথা তিনি নিজে থেকে লীলাদেবীকে নাকি বলেন নি। দৈবক্রমে লীলাদেবী নাকি চিঠিটা দেখতে পান, কিন্তু পরে আর সেটা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

—কি ভাবছো? স্যার সত্যপ্রকাশ আমার চোখের দিকে তাকালেন।

বললাম খবরের কাগজে পড়া ভাষাতত্ত্ববিদ অমলেশ মজুমদারের নিরুদ্দেশ হওয়া এবং তাঁর স্ত্রীর পাওয়া চিঠির কথা।

স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন,—লীলাদেবী প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের চিঠিটা পরে কেন খুঁজে পান নি জান?

—কেন?

—দিন পনের আগে আমায় পাঠান প্রফেসরের চিঠিটা দেখলেই তা বুঝতে পারবে। সেটা আমি যত্ন করে পকেটেই রেখে দিয়েছি।

বলতে বলতে স্যার সত্যপ্রকাশ পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

কিন্তু একি! এতো একদম সাদা একটা কাগজ। স্যার সত্যপ্রকাশ কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন নাকি?

—লীলাদেবী প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের চিঠিটা কেন খুঁজে পান নি সে রহস্য এবার উদ্ধার হোল তো?

আমি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দেখে স্যার সত্যপ্রকাশ একটু মুচকি হেসে বললেন—চিঠিটা এক ধরনের অদৃশ্য কালিতে লেখা। চিঠির কালির স্থায়িত্ব মাত্র কয়েকদিনের, যাতে চিঠির প্রাপক চিঠি পাবার পরই সে চিঠির লেখা আপনা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হোল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর স্যার সত্যপ্রকাশকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু এভাবে চিঠি লেখার কারণ কি হতে পারে?

—কারণটা বোঝা খুবই সোজা। প্রফেসর চান না, তাঁর চিঠির প্রমাণ কোন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে যাক।

এরপর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম,—আমাদের এখনকার গন্তব্য স্থানটা কোথায় জানতে

পারি ?

—আপাতত প্লেনে গৌহাটি। তারপর ক্রমশ প্রকাশ্য।

ওদিকে মাইকে ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। এবার আমাদের প্লেনে উঠতে হবে। কে জানে স্যার সত্যপ্রকাশ কোন্ পথে নিয়ে চলেছেন আমায়! এ পথের পরিণামই বা কি!

॥ দুই ॥

[সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ]

অনেকদিন পরে বেশ ভাল লাগছে প্লেনে উড়তে। কত উঁচুতে উঠছি, কে জানে! আমার সীটটা পড়েছে একেবারে জানলার ধারে। নীচে, বহু নীচে শ্যামল ধরিত্রী—বর্ণে, সুষমায় সুন্দর। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক মেঘ এসে দৃষ্টিকে দিচ্ছে আড়াল করে। কিন্তু তা আর কতক্ষণ।

স্যার সত্যপ্রকাশ এক নাগাড়ে বকবক করে চলেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর তথ্য নিয়ে। মানুষটার এই দোষ বা বদ অভ্যাস—বিজ্ঞান ছাড়া আর কোন কিছুতে বিশেষ আগ্রহ আছে মনে হয় না।

উনি বলছেন ওঁর সাম্প্রতিক গবেষণার কথা। বর্তমানে সারা দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পরিপ্রেক্ষিতে উনি বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকল্প একটা কিছু আবিষ্কার করতে চান। এটা নাকি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রয়োজনেও লাগবে।

কিন্তু তাঁর এই নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (স্যার সত্য-প্রকাশ যার নাম দিয়েছেন 'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ') বর্তমান প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে মস্ত অসুবিধা সৃষ্টি করেছে—তা হোল, এই রীতিতে উৎপন্ন বিকিরণ-শক্তি অন্য কোন বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার ওপর ক্রিয়া করে তাকে সাময়িক ভাবে হলেও বিকল করে দেয়। অর্থাৎ স্যার সত্যপ্রকাশের মতে, 'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ' এমন

একটি শক্তির উৎস, যা থেকে কোন এক বিশেষ ধরনের রশ্মিকণার বিকিরণ ঘটে এবং একটা নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত রকম ধাতব পদার্থ, তা যে অবস্থাতেই থাকুক, তাদের বিদ্যুৎ-পরিবহণ-ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এক কথায় বলতে গেলে, নতুন এই শক্তি ধাতু বা ধাতব পদার্থ সাময়িক ভাবে হলেও (বিকিরণের সময়কাল পর্যন্ত) বিদ্যুৎ পরিবহণের ক্ষমতা হারায়। অবশ্য স্যার সত্যপ্রকাশ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন—'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ-এর এই অসুবিধা দূর করে যাতে একে সত্যিকার মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায়।

—তাহলে আপাততঃ দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের সময়ে আপনার 'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ' খুবই উপযোগী হবে, বিশেষ করে শত্রুর ঘাঁটিতে।

কথাটা খুব যে একটা ভাবনা-চিন্তা করে বলেছি তা নয়, কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশের চোখ দুটো হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই একটা বৃহৎ আয়তনের হাই তুলে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—আপাতত আমি দেহ রাখলাম। ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিও।

মানুষটার একঘেয়ে বকবকানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমিও যেন বাঁচলাম।

আঃ! নীচেকার পৃথিবী কী সুন্দর!

॥ তিন ॥

[প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের দূত]

খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-গাড়ো পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে আমাদের প্লেন এসে নামলো গৌহাটি এয়ারপোর্টে।

সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম তারপর আমাদের পরবর্তী যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে অভিযান।

ইতিমধ্যে অবশ্য স্যার সত্যপ্রকাশের কাছে আমাদের যাত্রা পথের

লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছি।

আমরা চলেছি লুসাই পর্বতের গভীর অন্দরে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের গড়ে তোলা এক আশ্চর্য গবেষণা ভবনের উদ্দেশ্যে।

প্রথমে আইজল পর্যন্ত যেতে হবে। সেখানকার 'আইজল লজ'-এ নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের পাঠান পথপ্রদর্শক। সে আমাদের নিয়ে যাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

যাত্রা পথে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ যে ধরনের বিজ্ঞানী, আগে তাঁর আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যটা জেনে তারপর গেলে ভাল হোত না? বিশেষতঃ মাস খানেক আগে কলকাতা থেকে আর একজন মানুষ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অমলেশ মজুমদারকে তিনি চিঠি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও যখন তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি······

স্যার সত্যপ্রকাশ আমার সমস্ত উৎকণ্ঠা যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়ে বললেন—স্বপন, তোমায় আর একটু সাহসী ভেবেছিলাম। সময় আছে এখনও ফিরে যেতে পার।

এরপর আর কিছু বলতে পারিনি।

সেই থেকে মনটাকে ভবিষ্যতের ভাবনায় না রেখে বর্তমানটাকেই দেখার চেষ্টা করেছি।

সত্যিই এ এক অপূর্ব দেশ।

গৌহাটি থেকে মিটার গেজ রেলপথে প্রথমে এলাম শিলচরে। হাফ লং-এর কাছাকাছি একটা সরু পার্বত্য পথের ওপর দিয়ে ট্রেনটা যখন চলছিল সমস্ত হৃদপিণ্ডটার মধ্যে যেন এক আলোড়ন অনুভব করছিলাম। দু পাশে গভীর খাদ আর গিরিশ্রেণী। পাইন বনে ঘেরা খাসিয়া-জয়ন্তিয়ার এ রূপ হিমালয়ের কোন কোন অংশকে মনে করিয়ে দেয়।

শিলচরে এসে সে রাতটা সেখানেই কাটাতে হল। পরদিন অনুমতিপত্র জোগাড় করে টানা জীপে চড়ে রওনা দিলাম মিজোরামের পথে।

লুসাই পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে গড়ে ওঠা মিজোরাম অঙ্গরাজ্যের গভীরে আমাদের জীপ ছুটে চললো।

দুর্গম পাহাড় আর দুর্ভেদ্য পাইন বনের পথ অতিক্রম করে আমরা যখন মিজোরামের রাজধানী শৈলসহর 'আইজল'-এ হাজির হলাম তখন দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে !

আইজলে থাকার ব্যবস্থা 'আইজল লজ'-এ।

জীপ থেকে নেমে লজের গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম।

আর তখনই চোখে পড়লো—

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের দূত !

হাতে একটা লাল রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

এমন একটা সংকেতের কথাই নাকি চিঠিতে লিখেছিলেন প্রফেসর। কেউ কাউকে আগে না দেখলেও পরস্পরকে চিনে নিতে যাতে অসুবিধে না হয়। কথা ছিল নির্দিষ্ট সময়ে সে আইজল লজের সামনে অপেক্ষা করবে। সেই হিসেবে সবই ঠিক আছে।

তবু অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় মানুষটাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম !

॥ চার ॥

[গভীর অরন্যে গবেষণাগার]

চমকে ওঠারই কথা।

ও কি সত্যি মানুষ ?

লোকটাকে দেখে প্রথমেই কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়।

চেহারার গঠন কিছুটা স্থানীয় মিজোদের মতো হলেও—প্রকাণ্ড তার মাথা, অথচ তাতে এক গাছাও চুল নেই।

মরা মাছের মতো ওর ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন গা ছম ছম করে। সঙ্গে একটা কুকুরও ছিল। বড় বড় লোমে ঢাকা ফুটফুটে সাদা কুকুরটা—আমাদের দেখেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে

এগিয়ে এল। আশ্চর্য! আমরা যেন ওর কতদিনের চেনা। কিন্তু কুকুরের চোখ দুটোও কেমন যেন অদ্ভুত পাংশুটে। কুকুরের এমন চোখ আগে কখনও দেখিনি।

সে রাতটা আমরা কাটালাম 'আইজল লজ-এ'। পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়েছিলাম। একটাতে আমি আর স্যার সত্যপ্রকাশ, অন্যটাতে কুকুর নিয়ে সেই লোকটা। ও নিজের নাম বলেছে 'লী'।

স্যার সত্যপ্রকাশ অবশ্য সারাদিনে পথের এত ধকলেও কাহিল হন নি, দেখলাম। এই বয়সেও আশ্চর্য প্রাণশক্তি মানুষটার। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলেন। ফিরতে যখন জিজ্ঞেস করলাম, উনি সংক্ষেপে বললেন—এখানকার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস বাহিনীতে হঠাৎ জানাশোনা একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাছাড়া তাঁর একজন বিজ্ঞানী ছাত্রও থাকে এখানে, ওদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। অবিশ্বাস করার কিছু নেই। স্যার সত্যপ্রকাশের সারা পৃথিবীতেই বোধহয় চেনাজানা লোক ছড়ানো। অতএব এখানেও যে তেমন কাউকে পেয়ে যাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। তাই আর কিছু না বলে বিছানায় লম্বা হলাম।

পরদিন ভোর হতেই আবার আমাদের জীপ ছাড়লো। এবার আমাদের পথপ্রদর্শক প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের পাঠানো 'লী'।

লুসাই পাহাড়ের গা ঘেঁসে আঁকাবাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল অরণ্য। এ সব অঞ্চলে বৈরী-মিজোদের উৎপাত এখনও লেগেই আছে। ভাবলাম, এ সম্ভাবনার কথাটা আমাদের গাইড 'লী'-কে একবার জিজ্ঞেস করি। কিন্তু 'লী' ভাবলেশহীন চোখে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। হঠাৎ কেন জানি, মনে হোল, আসলে ও হয়তো মানুষই নয়। ভাবতেই অজান্তে গাটা ছমছম করে উঠলো। মুহূর্ত মধ্যে মনের জড়তা কাটিয়ে তাকালাম স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে। উনিও কি ভীষণ নির্বিকার! একটু বিরক্তভাবে চোখটা সরিয়ে নিতেই কুকুর-টার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। একদৃষ্টে

জন্তুটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু পশুর দৃষ্টি অমন অন্তর্ভেদী হতে পারে? আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কুকুরটা একবার ডেকে উঠলো 'ভৌ', তারপর 'লী'র পাশে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ওর দৃষ্টিটা তখনও আমার দিকে স্থির নিবদ্ধ।

লুংলেতে এসে পৌঁছলাম বিকেল নাগাদ।

এরপর কিছুটা অংশ হাঁটা পথ।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের গবেষণাগার লুসাই পাহাড়ের এক বনানী উপত্যকার মধ্যে।

লী পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। কুকুরটাও চললো পিছু পিছু ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।

জায়গাটা সভ্য-পৃথিবীর দৃষ্টির বাইরেই বলা যায়।

দূর থেকেই চোখে পড়লো অরণ্যসংকুল এলাকার মধ্যে কিছুটা অংশ পরিষ্কার করে সেখানে শক্ত কাঠের বিরাট এক গবেষণাগার বানিয়েছেন প্রফেসর।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ নির্জন। একটা পাখীও ডাকছে না কোথাও। নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজেরাই শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু আর ভাবনার সময় নেই। নিজের মনকে শক্ত করে বেঁধে এগিয়ে চললাম অজানা রহস্যের সন্ধানে।

॥ পাঁচ ॥

[ডাইরীর দিনলিপি]

৩রা জুন :

গতকাল বিকেলে এসে পৌঁছেছি। আজও সারাদিনটা কেটে গেল, কিন্তু প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি। মূল গবেষণাগার থেকে কিছুটা দূরে একটা ঝকঝকে ছোট্ট কুটিরে (অতিথিশালা?) আমাদের থাকতে দেওয়া

হয়েছে। এখানে মানুষজন বলতে তো এখনও কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু সকালে বিকেলে যখন যা প্রয়োজন লী এসে আমাদের দিয়ে গেছে। আর ওই সাদা লোমওলা কুকুরটা সারাক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। এমন অদ্ভুত-স্বভাবের কুকুর জীবনে দেখিনি। কিছু খেতে দিলেও মুখে তোলে না। শুধু মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে।

নাঃ, আজ আর ভাল লাগছে না। স্যার সত্যপ্রকাশ ইতিমধ্যেই পাশে খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ওঁর নাকের ভেতর থেকে যেরকম আওয়াজ বেরুচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয় ওখানে ডায়নামো জাতীয় কিছু ফিট করা আছে কিনা। আমার দু চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে। অতএব আজ এই পর্যন্ত।

৪ঠা জুন—সময় রাত এগারটা ঃ

আজও সারাটা দিন কাটলো আমার ঘরে শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে অথবা আশপাশের পাহাড়ী জঙ্গলে পদচারণা করে। লীকে একবার জিজ্ঞেস করলাম—প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ কখন দেখা করবেন, কিছু বলেছেন?

প্রশ্নটা শুনে লী আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো, পরিষ্কার বুঝলাম, আমার প্রশ্ন ওর মনঃপুত হয় নি। ঘড়ঘড়ে গলায় ভাঙা ইংরাজীতে বললো—সময় হলেই জানতে পারবেন।

স্যার সত্যপ্রকাশকে কিন্তু যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের কথা ওঁর সত্যিই মনে আছে কিনা আমার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে। আশ-পাশের পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান ছাড়াও উনি হঠাৎ কুকুরটাকে নিয়ে যে কেন এত মেতে উঠলেন বুঝতে পারছি না। কুকুরটাকে কখনও কোলে তুলে নিচ্ছেন, ওর পেটে মাথা রাখছেন, নানাভাবে আদর করছেন। ওর এই অহেতুক কুকুর প্রীতি কিন্তু আগে আমার জানা ছিল না। কিন্তু কুকুরটা দেখছি স্যার সত্যপ্রকাশকে আর একেবারেই পছন্দ করছে না। বোধহয় আদরের গুঁতো আর সহ্য করতে না পেরেই



কেবল ছট্‌ফটিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে কুটিরে আমি একা। স্যার সত্যপ্রকাশ সেই যে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। এই বৃদ্ধ বয়সে মানুষটার বুকের জোর আছে বলতে হবে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বোধহয় উনি ফিরলেন।

৫ই জুন—সকাল ১০টা ৩০ মি. ঃ

রহস্যের সূত্রগুলো যে শুধু আরো জট পাকিয়ে গেছে তাই নয়, পুরো ব্যাপারটাই মনে হয় এক ভয়ঙ্কর পরিণতির চেহারা নিতে শুরু করেছে। বিশেষতঃ গত রাতের ঘটনার পর। তারপর কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও এ সবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে স্যার সত্যপ্রকাশের চিঠিটা পেয়েই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে মুর্খের মতো এ অভিযানে ঝাঁপিয়ে না পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর এসব ভেবে কি লাভ!

ঘটনাটা বরং গোড়া থেকেই বলি।

গতকাল রাতে বসে ডাইরী লেখাটা প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় কুটিরের দরজায় করাঘাত। দরজা খুলে দেখি স্যার সত্যপ্রকাশ। একটা কিছু বলতে যাবো, উনি ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা কণ্ঠে বললেন,—চুপ। বাইরে এস, একটা জিনিস দেখবে।

ওঁর এক হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। তার মধ্যে কি যে আছে, ভগবান জানেন, আর অন্য হাতে একটা পেনসিল টর্চ।

কিছু না বলে স্যার সত্যপ্রকাশের অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

স্যার সত্যপ্রকাশ এগিয়ে চলেছেন প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের গবেষণা ঘরটার দিকে।

অন্ধকার ছমছমে রাত। চারদিক নিঃশব্দ। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। অন্ধকারে গা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের গবেষণা-ঘরের একেবারে পেছনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরটা একতলা হলেও বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে। ভেতরে বেশ কয়েকটা ঘর আছে মনে হয়। পেছনে একপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে স্যার সত্যপ্রকাশ চাপা গলায় বললেন—ঘরের ছাদে উঠতে পারবে ?

আমায় কিছু জবাব দেবার অবসর না দিয়ে আবার তিনি বললেন —চালার একধারে একটা ছোট্ট ফোকর আছে। সেখানে চোখ রাখলে অনেক কিছু দেখতে পাবে। কৌতূহল থাকলে নিঃশব্দে উঠে পড়। আমার জন্যে চিন্তা করো না।

কৌতূহল আমার মনে এখন পর্বত সমান জমে গেছে। স্যার সত্যপ্রকাশের কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে পাশেই যে গাছটা ছিল, সেটা বেয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়লাম ঘরের চালায়।

চালার একধারে সত্যিই একটা ফোকর আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে একটা আলোর রেখা।

ফোকরে চোখ রাখলাম।

একটা ঘরের এক বিশেষ অংশই চোখে পড়ছে কেবল।

যেটুকু চোখে পড়লো, তা আধুনিকতম আসবাবপত্তরে সাজান। পাশাপাশি তুটো সোফা আর কৌচে বসে রয়েছেন চারজন। এদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। মাত্র একজন পুরুষকেই ভারতীয় এবং বাঙালী বলে মনে হোল, আর বাকি তিনজনই বিদেশী। তবে উপস্থিত চারজনই যে যথেষ্ট অভিজাত এবং বিদগ্ধ মানুষ, তাদের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু চারজনের চেহারাতেই এক অসহায় বিষণ্ণতা জড়ানো। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। এদের কি জোর করে বন্দী করে রাখা হয়েছে ?

আর এদের সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছেন এবং একনাগাড়ে কি বলে চলেছেন, তিনিই কি প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ ?

ছ'ফুটের ওপর লম্বা মানুষটি। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ দেহ। বয়সের

কোন ছাপই পড়েনি ওই শরীরে। শক্ত চোয়াল, লম্বাটে মুখ। দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে পর্যন্ত যেন দাম্ভিকতা ফুটে বেরুচ্ছে। নামের সঙ্গে মিল রেখে কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। আর চোখ দুটো ভারী আশ্চর্য। কি যেন আছে সে চোখে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেই মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

কিন্তু ওরা কারা? এখানে এভাবে রয়েছে কি কারণে? আর প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভই বা কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান ওদের দিয়ে?

হঠাৎ কিছুদূর থেকে এখানকার সেই পোষা কুকুরটার ডাক শোনা গেল—ভৌ……ভৌ……

সর্বনাশ! আমাদের উপস্থিতি ওরা টের পেল নাকি? দ্রুত কুটিরের ছাদ থেকে নীচে নেমে এলাম। কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশ কোথায় গেলেন? আশ্চর্য! আশপাশ যতটা দৃষ্টি চালিয়ে সন্ধান করা সম্ভব তা করেও তাঁকে দেখতে পেলাম না। মানুষটা উবে গেল নাকি?

হঠাৎ পায়ের কাছে কি একটা ঠেকতেই তুলে ধরলাম—স্যার সত্যপ্রকাশের ছোট্ট পেনসিল টর্চটা।

হায়! এমন একটা কিছুর আশঙ্কাই আমার মন করছিল। বেশ কিছুক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম একই জায়গায়। দূরে কুকুরটা আর একবার ডেকে উঠলো! এবার আরও গভীর স্বরে—ভৌ…ভৌ…।

৬ই জুন :

গত রাতে একা কুটিরে ফিরে আসার পর অনেকগুলো উদ্বেগময় ঘণ্টা কেটে গেছে, কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশের কোন খবর পাইনি।

গত রাতে হঠাৎ কোথায় উবে গেল মানুষটা।

তবে কি কেউ ওঁকে নিঃশব্দে বন্দী করে নিয়ে গেছে?

কেন?

অনেক কথাই সারাদিন ধরে মনে তোলপাড় করছে। কিন্তু প্রশ্ন করে জানার একটা মানুষেরও দেখা পাইনি। আজ সকাল থেকে

লীর-ও কোন পাত্তা নেই। এমনকি খাবার দিতে পর্যন্ত আসেনি। শুকনো খাবার স্যুটকেশে যা ছিল তাই দিয়েই আজকের মতো পেট ভরিয়েছি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হচ্ছে দিনের আলোয় নিজে থেকেই গিয়ে দেখা করি প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে। কি ধরনের মানুষ তিনি—এই কদিনের মধ্যে একবার তাঁর এসে দেখা করার সময় হোল না! এই কি এক-জন জ্ঞানী বিজ্ঞানীর অতিথির প্রতি সৌজন্যবোধের নমুনা?

ভাবতে ভাবতেই মনে ভয়ের ছায়া পড়েছে।

গতকাল রাত্রে কুটিরের ফোকর দিয়ে প্রফেসরের যে চেহারা দেখেছি তা কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হতে পারে না। অত ক্রুর নিষ্ঠুর মুখ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

এই শয়তান-আস্তানা থেকে তবে কি আমার পালিয়ে যাওয়াই উচিত?

শেষ পর্যন্ত পালাতেও পারিনি। স্যার সত্যপ্রকাশের কথা ভেবেই। আমার মন বলছে ওঁর নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। এ সময় তাঁকে এখানে ফেলে পালিয়ে যাওয়া হবে চরম কাপুরুষতা!

তাছাড়া পালান বোধ হয় সম্ভবও নয়। আজ সকাল থেকেই দেখছি সেই অদ্ভুত কুকুরটা সারাক্ষণ ঘরে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার সামনে এখন আর অন্য কোন পথ নেই।

॥ ছয় ॥

[স্যার সত্যপ্রকাশের সন্ধান]

আমার হাত ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল চারটে। লী এসে আমার চোখ বেঁধে বন্দী করে নিয়ে চললো। কোথা দিয়ে কোথায় এলাম, জানি না। যখন চোখ খুলে দিল, দেখলাম সেটা

একটা প্রায়-অন্ধকার কুঠরী। মনে হয়, গবেষণা-ঘরেরই কোন এক অংশ। বেশ কিছুক্ষণ বাঁধা থাকায় চোখ দুটো টনটন করছিল। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই চোখ কচ্‌লাতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা সাদা রুমাল এসে পড়লো হাতের ওপর। সেই সঙ্গে একটা অতি-পরিচিত কণ্ঠ—চোখ না কচলে রুমালে করে ভাপ দাও, বেশী কাজ হবে।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে কুঠুরীর কোণের দিকে তাকিয়ে দেখি—স্যার সত্যপ্রকাশ। ও প্রান্তে কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই উনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন—বেশী আনন্দ না করে বরং যদি পার, তোমাদের ভগবানের নামটা এই বেলা করে নাও।

তার মানে?—আমি রীতিমত দমে যাই। কি বলতে চান উনি?

ধীরে ধীরে স্যার সত্যপ্রকাশ অনেক কথাই বললেন। শুনতে শুনতে যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্কে আমার শরীরের রক্ত পর্যন্ত জমে যাওয়ার উপক্রম হোল।

এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুগুহায় এসে নাকি ঢুকেছি আমরা। প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ ফাঁদ পেতেছিলেন। সেই ফাঁদে এসে আমরা পা দিয়েছি। শুধু আমরা নই—আমাদের মতোই এখানে আছেন আরো চারজন অসাধারণ ব্যক্তি যাদের গতকাল রাত্রে আমি গবেষণা ঘরের ছাদ থেকে দেখেছিলাম। তাঁদের একজন হলেন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ অমলেশ মজুমদার। দ্বিতীয় জন একজন নারী—বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী মিস্ ডোনা ভরনভ। তৃতীয় জন এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাশিয়ান চিকিৎসক ডাঃ ভিকটর ম্যানিয়েভ এবং চতুর্থ জন এক ড্যানিশ ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নেয়ারল্যাণ্ড ভোস্টার।

সম্ভবতঃ এদের প্রত্যেককেই কৌশলে আমন্ত্রণ করে এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কেন? সে উদ্দেশ্য এখনও সঠিকভাবে না জানা গেলেও স্যার সত্যপ্রকাশ আর একটি কথা যা শোনালেন, তা যেমন আশ্চর্য তেমনি অভূতপূর্ব: লুসাই পাহাড়ের এই উপত্যকায়

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের যে দুটি অনুচরকে আমরা দেখেছি, তারা কেউই আসলে রক্তমাংসের প্রাণী নয়! সেই অদ্ভুত 'লোক' লী এবং বড় বড় লোমওলা 'কুকুর'—ও দুটোই নাকি প্রফেসরের নিজস্ব গবেষণাগারে তৈরী 'রোবট' কিংবা বলা যায় 'যন্ত্র-দেহী'!

শুনে বিস্ময়ে আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম—কি বলছেন আপনি!

—হ্যাঁ স্বপন। চেঁচিও না। আস্তে কথা বলো। খুব আস্তে। প্রথম দর্শনেই ওদের দেখে আমার কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল, বিশেষতঃ চোখের দৃষ্টি—কেমন যেন অমানবিক ও অপ্রাণী-সুলভ। তখন থেকেই গোপনে অনুসন্ধান শুরু করি।

—কিন্তু এ আমি ভাবতেই পারছি না।

—প্রথমটা আমিও কম বিস্মিত হই নি। প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ কম্পিউটারব্রেন-চালিত এই রোবট দুটির মাধ্যমেই নিজের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—বিজ্ঞানকে কী অসীম শক্তির কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

বিস্ময়ের ধাক্কা আমার যেন তবু কিছুতেই কাটতে চায় না। আমি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না যে, সম্পূর্ণ মানুষ এবং কুকুরের আকার ও দুটো সজীব দেহ রক্তমাংসে গড়া নয়। অবশ্য ওদের চাল চলন আমার কাছেও গোড়া থেকেই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে, কিন্তু···

—কুকুরটাকে সব সময় আমাদের কাছে রাখা হোত। কারণ কি জান? আসলে ওটা একটা গোয়েন্দা যন্ত্র। ওর চোখের টেলিস্কোপিক লেন্সের মাধ্যমে গবেষণাগার থেকে আমাদের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করা হোত এবং ওর কানের মধ্যে লাগানো শক্তিশালী মাইক্রোফোনও আমাদের কথাবার্তা পৌঁছে দিত যথাস্থানে।

—কিন্তু আপনি এত কথা জেনে ফেললেন কি করে? স্যার সত্যপ্রকাশ নীরবে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—স্বপন, ভুলে যেও না, আমিও একজন বিজ্ঞান-সেবক। কিন্তু আসল জানার

এখনও অনেক বাকি। তা বোধহয় জানা যাবে খুব শিগ্‌গির।

ক্ষণকাল কি যেন ভাবলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—পেনসিল টর্চটা সঙ্গে এনেছ ?

একটু অবাক হলাম। বর্তমান অবস্থায় টর্চটা দিয়ে কি হবে ? পকেট হাতড়ে বললাম—হ্যাঁ, এনেছি।

—ওটা দাও তাড়াতাড়ি।

টর্চটা নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে রাখতে রাখতে আমার হাঁ-করা মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে তিনি বললেন—ওটা বন্ধ করো। আর কোন কথা নয়। শেষ অঙ্ক শুরু হবার আর বোধহয় দেরি নেই।

॥ সাত ॥

[ভয়ঙ্করের মুখোমুখি]

আমার হাত-ঘড়িতে এখন ঠিক রাত এগারটা বেজে পনের মিনিট। নিদারুণ চাপা উত্তেজনায় ভুগছি। সেইসঙ্গে এক অজানা আতঙ্কেও।

আমি আর স্যার সত্যপ্রকাশ একটা সোফায় পাশাপাশি বসে আছি। আশপাশে রয়েছে আরও কয়েকটা সোফাকাউচ। সেগুলোতে বসে আছেন গত রাতে দেখা সেই চারজন। এই ঘরটাই চালার ফোকর দিয়ে দেখেছিলাম গতকাল। কিন্তু তখন সম্পূর্ণ ঘরটা দেখতে পাই নি। এখন পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সারা ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছি।

ঘরটা বেশ বড় আকারের। দেয়াল, মেঝে, ছাদ সবটাই কাঠের। বেশ কিছু অদ্ভুত আকৃতির যন্ত্রপাতি চারপাশে ছড়ানো। নানা ধরনের সুইচবোর্ড, কয়েকটি টিভি ক্যামেরা—তাতে প্রতিক্ষণে ফুটে উঠছে নানা ধরনের রেখাতরঙ্গ, দৃশ্যাবলী। এ ছাড়া আরো অনেক ধরনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টিপয়ের ওপর একটা ধাতব যন্ত্র। আকার একটা বড় বাঁধাকপির মতো। রঙটা কালো। তবে তা থেকে নানাধরনের শুঁড়ের মতো জিনিস বেরিয়ে রয়েছে। হঠাৎ

দেখলে গা ঘিনঘিন করে।

টিপয়টার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ। কিছু আগে তিনি এসেছেন। ওঁর একটা হাত টিপয়ের ওপর। কুচকুচে কালো শরীরটা আজ যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখ দুটো মনে হয় জ্বলছে আগুনের গোলার মতো। একপাশে দাঁড়িয়ে 'লী', স্যার সত্যপ্রকাশ আজ সন্ধ্যেবেলা যাকে একটি যন্ত্রমানব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লীর শরীরটা স্থির, নিস্পন্দ। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলাম ওকে। সত্যি, চোখের পাতা পড়ে না। কুকুরটা ঘরে নেই। বোধহয় ওই গোয়েন্দা যন্ত্রটি গবেষণাগারের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সতর্ক প্রহরায়।

প্রফেসর কৃষ্ণল্লবভ গমগমে স্বরে পরিষ্কার ইংরাজীতে কথা বলে উঠলেন—আমার এই গবেষণাগারে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম্। আপনাদের প্রত্যেককেই আমি চিঠি পাঠিয়ে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি। কিন্তু সেই হিসেবে হয়তো অতিথিদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারি নি। এজন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু আসলে আমি বৈজ্ঞানিক, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কাছে অন্যান্য মানবিক কর্তব্য কিংবা চিন্তা-ভাবনার স্থান আমার কাছে নেই। আমার কাছে একমাত্র উদ্দেশ্য, যে কোন উপায়েই হোক না কেন আমার বিজ্ঞান গবেষণাকে সম্পূর্ণ করা।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ থামলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মানুষটার বাকপটুতা দেখে। প্রফেসর শুধুমাত্র একজন মেধাবী বৈজ্ঞানিকই নন, সেইসঙ্গে সুবক্তাও বটে। ঘরের প্রতিটি মানুষ কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে বসে রয়েছে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের মুখের দিকে তাকিয়ে। স্যার সত্যপ্রকাশ কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকার।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন—আপনাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই যে, দীর্ঘ বিশ বছর আগে একদিন আপনাদের সভ্য সমাজ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলাম যে উদ্দেশ্য

বুকে নিয়ে, আজ সে পথে সাফল্যের কাছাকাছি আমি এসে গেছি।

আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'সুপার ইলেকট্রনিক্ কম্পিউটরব্রেন'। এক অতি-ধীশক্তিসম্পন্ন মগজ তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, যে যন্ত্র-মগজ বুদ্ধি, জ্ঞান এবং মৌলিক চিন্তায় হবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

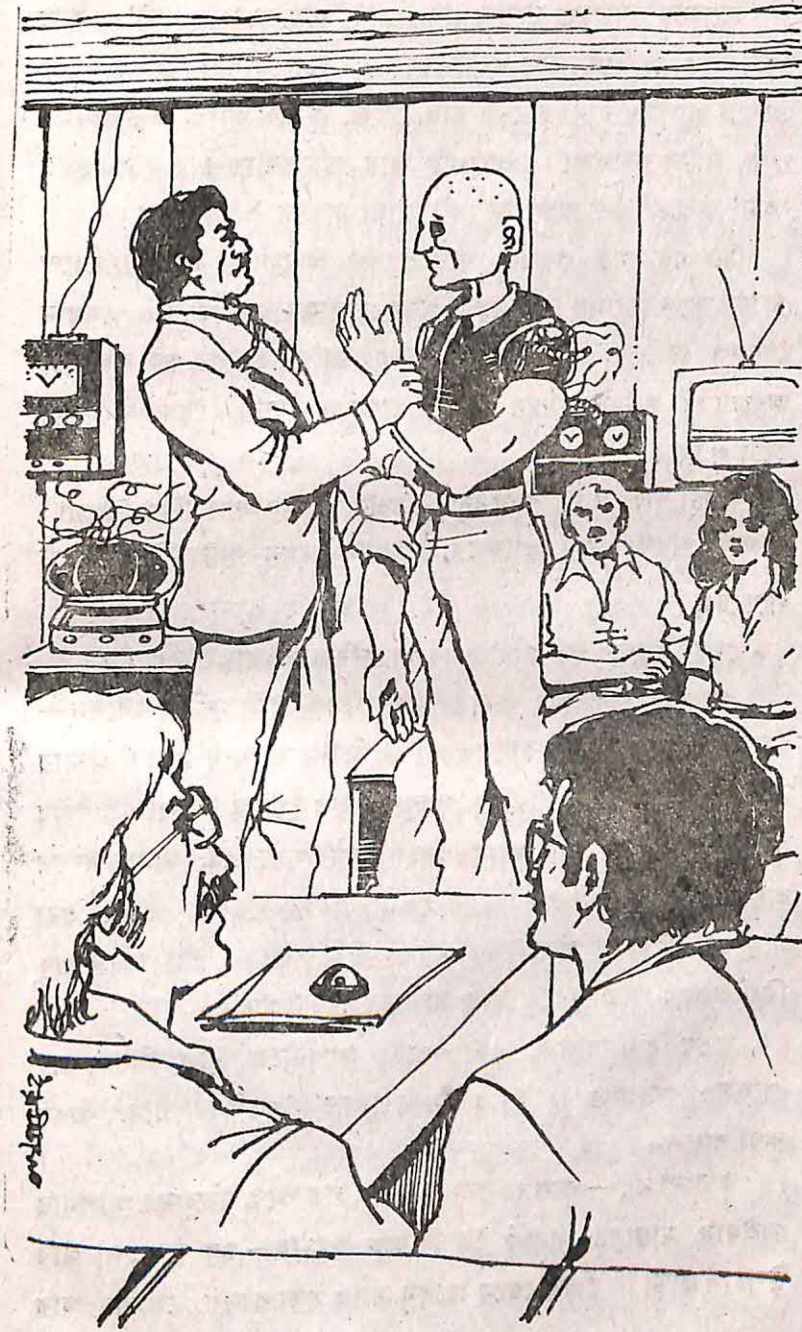
কিন্তু আমার এ গবেষণাকে পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য সমাজ করেছে ব্যঙ্গ আর উপহাস। হুবহু মানুষের মতো মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ব্রেন তৈরি নাকি সম্ভব নয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে একদিন আমায় বিদ্রূপ করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডঃ তাকাশি কাওয়াতা। আমি তা সহ্য করতে পারি নি। তাই তাঁকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। তারপর সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে এই দুর্গম লুসাই পাহাড়ে গবেষণাগার তৈরি করে বছরের পর বছর আমি আমার নির্জন সাধনা চালিয়েছি। মানুষের মগজের থেকেও উন্নত একটা সুপার ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ব্রেন তৈরি না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।

সে গবেষণা কি আপনার সফল হয়েছে বলতে চান? —ড্যানিশ ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নেয়ারল্যাণ্ড ভোস্টার দুম করে প্রশ্নটা করলেন।

হ্যাঁ, সে দাবী আমি নিশ্চয়ই করতে পারি।—হঠাৎ যেন অহেতুকই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ: তার প্রমাণ আমার এই অনুচর 'লী' আর ফুটফুটে সাদা কুকুর 'লুসী'। এরা কেউই অস্থিমজ্জাসর্বস্ব প্রকৃত জীব নয়। আমারই ল্যাবোরেটারীতে তৈরি যন্ত্র-দেহী।

এ চমক আমার কাছে নতুন না হলেও, তথ্যটা শুনে অন্যান্য অতিথিরা ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। ইতালীয় শিল্পী মিস্ ভরনভ তো অজ্ঞান হয়েই ঢলে পড়লেন কাউচের ওপর।

একটা ক্ষীণ বিদ্রূপের রেখা ছুঁয়ে গেল প্রফেসরের ঠোঁটের কোণায়। রুশ ডাক্তার ভিকটর ম্যানিয়েভ দেরী না করে এগিয়ে এসে স্মেলিং সল্টের শিশিটা মিস্ ভরনভের নাকের কাছে ধরতে,



ধীরে ধীরে তিনি আবার জ্ঞান ফিরে উঠে বসলেন।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ তাঁর কথার প্রমাণ দিতে ততক্ষণে 'লী'-র হাত দুটো খুলে ফেলেছেন তার শরীর থেকে। বিচ্ছিন্ন অংশটা থেকে বেরিয়ে এসেছে একরাশ নানা ধরনের তার, হুইল, স্ক্রু এবং আরো কত রকমের সূক্ষ্ম, জটিল কলকব্জা। প্রফেসর তাঁর সুইচবোর্ডের একটা সুইচ 'অন' করতেই ওই অবস্থায়ই 'লী' মাথা নাড়তে শুরু করলো।

ঠিক এই সময় কুকুরটা ঘরে প্রবেশ করলো। প্রফেসর তাকে কোলে তুলে নিমেষে তার মুণ্ডুটা খুলে ফেললেন ধড় থেকে। সেখান থেকেও বেরিয়ে এল কত রকম কলকব্জা। তারপর ওই কন্ধকাটা অবস্থাতেই কুকুরটা ঘরময় ছুটে বেড়াতে লাগলো। যেন দম দেওয়া ছুটো পুতুল।

দৃশ্যটা বীভৎস। শরীরের ভেতরটা আমার পাক দিয়ে উঠলো। সকলের অবস্থা দেখে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ এবার মুখে তির্যক হাসি ফুটিয়ে বললেন—মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও যন্ত্র কোনদিন তা করে না। আমার প্রথম এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। আমার কুকুর 'লুসী' এবং চাকর 'লী' আমার সকল কর্মের সঙ্গী এবং আমার সম্পূর্ণ অনুগত। তার পরিবর্তে ওদের কোন চাহিদা নেই। কারণ ওরা মানুষের মতো বিশ্বাসঘাতক নয়। ওরা যন্ত্র। ওরা জানে শুধু নিখুঁতভাবে কাজ করতে আর আমার সেবা করতে।

মানুষ বিশ্বাসঘাতক, এই কথাটা আপনাকে তুলে নিতে হবে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ। স্যার সত্যপ্রকাশ এতক্ষণ বাদে প্রথম কথা বললেন।

কক্ষনো না,—প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ চিৎকার করে উঠলেন: আপনার বেইমান মানুষের সমাজ কি দিয়েছে আমায়—শুধু অবহেলা আর উপহাস ছাড়া। কিন্তু জেনে রাখুন স্যার সত্যপ্রকাশ, সেদিন আর

বেশী দূরে নেই যখন সারা পৃথিবী এসে প্রতিদিন করজোড়ে কৃপা প্রার্থনা করবে আমার কাছে।

কি কারণে? আপনার ওই উদ্ভট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্যে?—স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হোল প্রফেসরকে আরো উত্তেজিত করে তোলাই ওঁর আসল মতলব।

হ্যাঁ তাই।—স্যার সত্যপ্রকাশের মন্তব্যে যেন চিড়-বিড়িয়ে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর: কিন্তু জেনে রাখুন, আজ উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিলেও পরে আর কেউ রেহাই পাবে না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রফেসর,—স্যার সত্যপ্রকাশ খুব ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন: আপনি যা করতে চেয়েছেন তা অনেকাংশে সফল হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আপনার ওই যান্ত্রিক কুকুর ছানা আর যন্ত্রমানব 'লী'ই কি আপনার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সার্থক করবে, বলতে চান?

স্যার সত্যপ্রকাশের ব্যঙ্গটুকু প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের উত্তেজনায় যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল। অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে দমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—একটু শুধু বুঝতে ভুল হয়েছে আপনার। আমার যান্ত্রিক কুকুর ছানা 'লুসী', কিংবা যন্ত্রমানব 'লী', এরা নিছকই আমার এক্সপেরিমেণ্ট। ধাপে ধাপে আমি পরীক্ষার স্তর বদলেছি। আমার প্রকৃত লক্ষ্য একটি সুপার ইলেকট্রনিক ব্রেন, বুঝতে পারছেন? বেশ, এবার এদিকে একটু দেখুন, মহাবিজ্ঞানী মশাই।

শেষ দিকে দুঃসহ রাগে যেন ফেটে পড়লেন প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘর নিস্তব্ধ। তারপর টিপয়ের ওপর রাখা বাঁধাকপি আকারের শুঁড়-বার-করা সেই উদ্ভট কালো জিনিসটার দিকে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ঘরের প্রতিটি প্রাণী স্তব্ধ। স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হোল, উনিও হঠাৎ কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছেন।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ পরিস্থিতিটা খুবই তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেন। ওঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো এক তীব্র তিক্ত হাসির রেখা।

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রফেসর বললেন—আমার এক্সপেরিমেণ্ট শেষ করতে শুধু একটা কাজই বাকি আছে, আর সেই কারণেই সারা পৃথিবীর সেরা মস্তিষ্ক আপনাদের কয়েকজনকে বেছে বেছে আমার এই গুপ্ত গবেষণাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এনেছি।

কি বলতে চান প্রফেসর? সব কিছুই আমার যেন আবার গুলিয়ে যেতে থাকে।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ আবার শুরু করলেন—আপনারা সকলেই হয়তো জানেন, আধুনিক কম্পিউটারের প্রাণস্বরূপ যে ট্রান্‌জিস্টার তার তুলনা করা যায় একটি মানুষের মগজের স্নায়ুকোষের সঙ্গে। একটি সাধারণ মানুষের মগজের স্নায়ুকোষের মোট সংখ্যা হোল প্রায় দু হাজার আর ওজন ১৩০০ গ্রাম। মানুষের মগজের স্নায়ুকোষের সমসংখ্যক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে একটি কম্পিউটারের ভর দাঁড়াবে প্রায় ১০০ টন। অর্থাৎ যা অবিশ্বাস্যরকম বিশালাকৃতি এবং কোনভাবেই সম্ভব নয়।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই শুনছে। একটু থেমে কৃষ্ণবল্লভ আবার বলেন—কিন্তু তবু এই অবস্থাটাকে কার্যকর করার একটিমাত্র উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি। তা হোল—কোন বিশেষ উপায়ে কিছু উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মগজের স্নায়ুকোষের তথ্যধারণ-ক্ষমতাকে যদি সরাসরি চালান করে দেওয়া যায় কম্পিউটার ট্রান্‌জিস্টারের কৃত্রিম স্নায়ুকোষের মধ্যে। এর দ্বারা মানুষের মগজের যেখানে প্রায় $১০^{১৩}$ সংখ্যক তথ্যধারণ-ক্ষমতা আছে, যার মধ্যে পৃথিবীর সব থেকে বড় লাইব্রেরীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার জমা হতে পারে সেখানে আমি মগজের তথ্যধারণ-ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করে অকল্পনীয় $১০^{৬০}$ সংখ্যক তথ্যধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন মগজ তৈরি করতে পারি। তার ফলে যে মগজের মালিক আমি হবো, তা হবে পৃথিবীর এ যাবৎ অর্জিত সকল

জ্ঞান এবং আরও উন্নত মৌলিক চিন্তার অধিকারী। সারা পৃথিবীটা তখন হবে আমার উপনিবেশ আর মানুষগুলো আমার ক্রীতদাস।

আবার হাসতে শুরু করেন প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ—ভয়াল ভয়ঙ্কর সে হাসি।

কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব করবেন আপনি?—রুশ শল্য চিকিৎসক ডঃ ভিকটর ম্যানিয়েভ যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্নটা করেন।

প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ তাঁর দিকে তাকান, তারপর হাসি থামিয়ে হিস হিস স্বরে বলেন—সেই জন্যেই তো চিঠি দিয়ে এনেছি আপনাদের। আজই রাত্রে আমি অপারেশন শুরু করবো। ডঃ অমলেশ মজুমদার, মিস ডোনা ভরনভ, ডঃ ভিকটর ম্যানিয়েভ, অধ্যাপক নেয়ারল্যাণ্ড ভোস্টার এবং স্যার সত্যপ্রকাশ, আপনাদের পাঁচজনের মগজে এ যাবৎ জমে থাকা সমস্ত তথ্য এবং স্নায়ুকোষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালান করে দেব আমার ওই ছোট্ট সুপারব্রেন ট্রান্‌জিস্টারটার মধ্যে। কাজ শেষ হলেই আপনাদের অকেজো নির্বাক দেহগুলো তলিয়ে যাবে হাজার ফুট গভীর দুর্গম খাদের তলায়। কেউ কোনদিন আর খোঁজ পাবে না। তারপর ওই ট্রান্‌জিস্টার ব্রেন স্থাপন করবো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এক ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে। প্রতিনিয়ত সে জোগাবে আমায় কত অজানা বিস্ময়কর তথ্যরাশি। নতুনভাবে জেগে উঠবে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ।

—শয়তান!—ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ অমলেশ মজুমদার দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে ওঠেন।

আবার একচোট হেসে নেন প্রফেসর, তারপর বলেন—আপনাদের অবস্থা অনুমান করে খুবই দুঃখিত ডঃ মজুমদার। কিন্তু ইতিহাসে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে মানুষকে এর থেকেও বড় মূল্য দিতে হয়েছে। এবার আপনারা মনে মনে প্রস্তুত হোন। এখুনি আমার কাজ শুরু হবে।

বলতে বলতে অধ্যাপক কৃষ্ণবল্লভ 'লী' আর 'লুসী'কে আবার আগের মতো কর্মক্ষম করার কাজে মন দিলেন। নির্বিকার মুখে

বসে আছেন সত্যপ্রকাশ। পকেট থেকে তিনি বের করলেন পেনসিল টর্চটা। আতঙ্ক ও উদ্বেগে আমার তো তখন প্রায় মর-মর অবস্থা। হঠাৎ আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, টর্চটার কোথায় একটু টিপ দিতেই তার পেছনের অংশ বেশ কিছুটা সরে গেল। মূল অংশের ভেতরে জ্বলে উঠলো একটা নীল আলো—নীল ফুটকি যেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে টর্চটা নাড়াচাড়া করতে করতে স্যার সত্যপ্রকাশ সেটা চোখের বা মুখের কাছে এনে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হতে বোধহয় সেকেণ্ড চার/পাঁচ সময় লাগলো। প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের মনোযোগ তখনও 'লী' ও 'লুসী'র দিকে।

পরক্ষণে—হ্যাঁ, ঠিক পরক্ষণেই ঘটলো সেই আশ্চর্য ভয়ঙ্কর ঘটনাটা।

বাইরে কোথায় যেন বজ্রপাতের মতো একটা প্রচণ্ড উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠলো। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। তাহলে এ বজ্রপাতের উৎস কোথায়?

তার পরই হঠাৎ একযোগে অন্ধকার হয়ে গেল সমস্ত তল্লাটটা—সেই সঙ্গে নিভে গেল গবেষণাগারেরও সব আলো।

আমরা সবাই ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। বিমূঢ় অবস্থা কাটবার আগেই শুনলাম স্যার সত্যপ্রকাশের চাপা গম্ভীর কণ্ঠ—সবাই হুঁশিয়ার থাকবেন! আর প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ, আপনার আশা পূর্ণ হবার আগেই বোধহয় সব খেলা শেষ হয়ে গেল।

বাইরে দ্রুতগতিতে কয়েকটা জীপ ছুটে আসার শব্দ পাচ্ছি।

হঠাৎ গবেষণাগারের অন্য এক কোণ থেকে ভেসে এল প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের বীভৎস ক্রূর কণ্ঠ—বেইমানি! বেইমানি! গেল, গেল! আমার সারা জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল!

তার পরেই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চারদিক যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দুম্‌দাম্‌ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ভেঙে পড়তে লাগলো কত কিছু। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি যেন একটা আঘাত করে সজোরে ছিটকে ফেলে দিল আমায় সোফাটা থেকে।

অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে শুনতে পেলাম দূর থেকে প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের ভয়াল উন্মাদ অট্টহাসি—হাঃ…হাঃ…হাঃ…হাঃ… !!

॥ আট ॥

[পরিণতি]

স্যার সত্যপ্রকাশ-আবিষ্কৃত 'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ'ই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল আমাদের। কথায় বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! এখানে আসবার সময় প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের খারাপ কিছু একটা মতলব থাকতে পারে অনুমান করেই নাকি স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর এই বিশেষ জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর শিলচর ও আইজলে নেমে ওখানকার সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের ইন্‌সপেক্টর মিঃ মাথুরকে সব কিছু জানিয়ে তিনি ব্যবস্থা পাকা করেন এবং বিজ্ঞানী ছাত্রটিকেও ঠিকমতো তালিম দেন। এর পর ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার আগের দিন কোন এক সময়ে স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর ওই আজব যন্ত্রটি মিঃ মাথুর ও তাঁর বিজ্ঞানী ছাত্রের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে গোপনে যথাস্থানে 'ফিট' করেন। স্থির হয়, স্যার সত্যপ্রকাশের কাছ থেকে বেতার-সংকেত পাওয়া মাত্র বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। কোন প্রতিকূল কারণে ওই সংকেত পাঠানো যদি সম্ভব নাও হয়, তা হলেও বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে এবং তার সময় নির্ধারণ করা হয় পরদিন রাত একটা। তা ছাড়া ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মাথুরও কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে তাঁর বাহিনীসহ লুকিয়ে রইলেন।

এর পরের ঘটনা অনুমান করা কঠিন নয়। পেন্‌সিল টর্চের মধ্যে লুকনো ছিল গুপ্ত বেতার-যন্ত্র। স্যার সত্যপ্রকাশের কাছ থেকে সংকেত পাওয়া মাত্র 'সুপার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ' নির্দিষ্ট সময় মতো তীব্র ইলেক্‌ট্রনিক রশ্মি বিকিরণ করে অচল করে দিল প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভের গবেষণাগারের সমস্ত ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রগুলি। এই অবসরে ইন্‌স্‌পেক্‌টর মাথুর নির্দ্বিধায় দলবলসহ ঢুকে পড়লেন গবেষণাগারের মধ্যে।

কিন্তু এত কাণ্ডের পরও প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভকে গ্রেপ্তার করা গেল না। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হওয়া মাত্র বিশেষ কৌশলে নিজের হাতে এতকাল ধরে গড়া গবেষণাগারটা ধ্বংস করে আবার নিরুদ্দেশ হয়েছেন ওই উন্মাদ প্রফেসর। ইন্‌সপেক্‌টর মাথুর তাঁর পুলিসবাহিনী নিয়ে সারা এলাকাটা ঘিরে ফেলেছিলেন। নিজেও বেশ কয়েকদিন ধরে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালালেন চতুর্দিকে। কিন্তু প্রফেসর কৃষ্ণবল্লভ হঠাৎই যেন হাওয়ায় উবে গেছেন। কোথাও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

মানুষটা সব দিক থেকেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সন্দেহ নেই কিন্তু আমি ভাবছিলাম—লোভ আর জিঘাংসা এমন এক প্রতিভাবানকেও কি ভাবে এক ভয়াবহ চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

॥ নয় ॥

[শেষ কথা]

স্যার সত্যপ্রকাশ পরদিন কিন্তু পাড়ি জমিয়েছেন রাজস্থানের রতনপুরে তাঁর নিজের জায়গায়। হাতে নাকি অনেকগুলি গবেষণার কাজ পড়ে রয়েছে। তাই একদম সময় নেই। তা ছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য-টৃশ্য দেখার আগ্রহ তাঁর কোনদিনই বিশেষ নেই—যাবার আগে এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। আর বিদায় নেবার আগে রতনপুরে যাবার জন্যে আমায় আমন্ত্রণ জানাতে ভোলেন নি।

প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হলে কি হয়—অন্য ব্যাপারে মানুষটা একদম বেরসিক। আমি কিন্তু এখন এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছি না। আরও কটা দিন অন্ততঃ কাটিয়ে যাব এই দুর্গম সৌন্দর্যের দেশে, ভয়ঙ্কর লুসাই পাহাড় এখন আমার কাছে রূপ বদলে—অপরূপা!

ওবরুত দ্বীপের সাদা দৈত্য

২রা নভেম্বর ঃ

বিকেলে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখলাম। আজকের ডাকেই এসেছে। চিঠিতে পোস্ট-অফিসের সীলমোহরে রতনপুরের ছাপ আর ঠিকানা-লেখা হস্তাক্ষর দেখে বুঝতে দেরি হল না এ চিঠির প্রেরক কে। খামের মুখ ছিঁড়ে পড়ে ফেললাম ঃ

"প্রিয় স্বপন,

মাসখানেকের ছুটির বন্দোবস্ত করতে পারবে? যদি পার, চটপট চলে এসো। খুব শীগ্‌গির এক আশ্চর্য অভিযানে বেরুতে হচ্ছে আমায়। সঙ্গে থাকবেন প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ডঃ জর্জ গ্রাহাম। তোমাকেও সঙ্গী করার ইচ্ছে আছে। যদি আসতে পার, বিস্তারিত জানতে পারবে।

শুভেচ্ছা রইল।

ইতি

তোমাদের

স্যার সত্যপ্রকাশ"

চিঠি পেয়ে আর অপেক্ষা করি নি। বেশ কিছুদিন যাবৎ ছটফটে মনটা পালাই-পালাই করছিল। তাই এই মুহূর্তে স্যার সত্যপ্রকাশের চিঠিটা যেন চাতক পাখীর কাছে এক টুকরো কালো মেঘ!

ভাবছি আগামীকালই ট্রেনের টিকিট কাটবো।

১৭ই নভেম্বর ঃ

ডাইরি লিখতে বসেছি পৃথিবীর একেবারে অপর প্রান্তে বসে। এটি আটলান্টিক মহাসাগরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকশো মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি দ্বীপ। দ্বীপটির আয়তন পঞ্চাশ বর্গমাইলের বেশী হবে না। এর স্থানীয় নাম ওবরু। পৃথিবীর মানচিত্রে এ দ্বীপের কোন নাম পাই নি। আমার তো মনে হয় শুধু

আমি কেন, এর অস্তিত্বের কথা খুব কম লোকই জানেন। স্যার সত্যপ্রকাশ বললেন, এ ধরনের ছোট-খাট হাজার হাজার দ্বীপ এখনও নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরগুলিতে ছড়িয়ে আছে, সভ্য পৃথিবী আজও তাদের খবর বিশেষ রাখে না। আটলান্টিক মহাসাগরে ওবরু দ্বীপ এমনই এক অখ্যাত, অবজ্ঞাত স্থলভাগ।

এই অবহেলিত স্থলভাগটি আজও একইভাবে পৃথিবীর মানুষের মনোযোগের বাইরে থেকে যেত, যদি না সম্প্রতি ওখানকার সম্পর্কে সভ্য ছনিয়ার একজন মানুষের মনে কিছু বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হত।

ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো।

ডক্টর জর্জ গ্রাহাম একজন সমাজ-বিজ্ঞানী। বেশ কিছু বছর যাবৎ উনি গবেষণা চালাচ্ছেন বিভিন্ন দেশে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস এবং মানুষের বর্তমান প্রজন্ম সম্পর্কে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্যে সারা পৃথিবী পর্যটন করতে হয়েছে ওঁকে। এ সময়ই দৈবাৎ উনি এসে হাজির হন আটলান্টিক মহাসাগরের এই অখ্যাত দ্বীপ ওবরুতে। পাহাড় আর অরণ্যে ঢাকা এই ছোট দ্বীপটায় এখনও বিরাজ করছে মানুষের আদিম জীবনধারা। বহু কাল আগে আমেরিকান রেড-ইণ্ডিয়ানদের একটি শাখা এখানে এসে সম্ভবত প্রথম বসতি স্থাপন করে। তাদের সেই পুরোনো জীবনযাত্রাকে আজও বজায় রেখেছে এরা। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, নানা কুসংস্কার আজও তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ডক্টর গ্রাহাম ওবরু দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের বর্তমান জীবনধারায় এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন, যা নিছক কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে তাঁর মন চায় নি, আর এই বিষয়েই আমেরিকার 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর এক বিশেষ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ পাঠিয়েছিলেন তিনি। নিবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল আদিম মনুষ্য-সমাজে আপাত-কুসংস্কারগুলির উৎসে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন ঐতিহাসিক অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে

ওবরু দ্বীপের কথা এই নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস, স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দৈত্য তাদের প্রধান রক্ষাকর্তা। এ সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে চললেও যেটুকু জানা গেলো তাও কম বিস্ময়কর নয়। তাদের এই দৈত্য নাকি রূপকথা বা ভগবানের মতো কল্পলোকে বাস করেন না। তাঁর বাস দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত এবং অরণ্যে ঘেরা ওবরু দ্বীপেরই কোন অংশে। সকল রকম আপদ-বিপদ থেকে নিয়ত ওবরু দ্বীপবাসীদের রক্ষা করে চলেছেন ওই দৈত্য, ওদের ভাষায়, সাদা দৈত্য।

নিবন্ধটি 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত হবার পর ডক্টর গ্রাহামকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন পত্রলেখক ব্যক্তিগত আক্রমণ করে সরাসরি দোষারোপ করেছেন যে, বর্বর উপজাতিদের মধ্যে থাকায় জংলী কুসংস্কারগুলো তাঁকেই ভর করেছে। তা না হলে জংলী বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি নিবন্ধ রচনা করতে পারেন? জনৈক পত্রলেখক তো তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে আগে নিজের মানসিক চিকিৎসা করাতে। অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানী এবং প্রাণীতাত্ত্বিক মহলও এসব ব্যাপারে তাঁর সমর্থনে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ডক্টর জর্জ গ্রাহাম খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন তাঁর নিবন্ধের এই অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ায়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি একটা চিঠি পেলেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে—স্যার সত্যপ্রকাশের চিঠি। ওবরু দ্বীপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন তিনি। খুশী হলেন ডক্টর গ্রাহাম। স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর পুরোনো বিজ্ঞানী বন্ধু। গ্রাহাম একদিন নিজেই সরাসরি উড়ে এসে হাজির হলেন রাজস্থানের রতনপুরে স্যার সত্যপ্রকাশের গবেষণাগারে।

কয়েকদিন ধরে দুজনে অনেক কথাবার্তা সলাপরামর্শ হল। তারপর স্যার সত্যপ্রকাশ সিদ্ধান্ত নিলেন—ওবরু দ্বীপে তিনি অভিযান করবেন। ওই সাদা দৈত্যের রহস্যটা অদ্ভুত মনে হয়েছে

তাঁর কাছে। এ ব্যাপারে ডক্টর গ্রাহামকে তিনি বিশ্বাস করেন। এর পরই আমায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। চিঠি পাবার দু তিন দিনের মধ্যেই আমি গিয়ে হাজির হয়েছি রতনপুরে। সেখান থেকে অভিযান শুরু হয়েছে আমাদের।

প্রথমে প্লেনে ন্যুইয়র্ক। সেখান থেকে একটা মজবুত মোটরলঞ্চ ভাড়া করে আটলান্টিকে পাড়ি দিয়ে ওবরু দ্বীপ। বেশ দুঃসাহসিক অভিযান। অভিযাত্রীদের মধ্যে আছেন ডক্টর গ্রাহাম, স্যার সত্যপ্রকাশ, আমি আর দুজন ইয়াঙ্কি খালাসী। ওদের নাম ডিক আর জিম। শুরু থেকেই আমার বেশ থ্রিলিং লাগছে ব্যাপারটা।

এত কিছু উদ্যোগ-আয়োজনের পর আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি সবে মাত্র দুদিন আগে।

গ্রাহাম এর আগে এখান থেকে ঘুরে গেছেন। এখানকার অবস্থা, আদিবাসীদের রীতি-নীতি, চাল-চলনের কথা মোটামুটি জানেন তিনি। এ অভিযানে তিনিই আমাদের গাইড।

শুধু তা-ই নয়, বেশ করিৎকর্মা মানুষ এই গ্রাহাম। এর আগেরবার এসেই এখানকার জংলী সর্দারের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, এবারে সেটা কাজে লাগল। আসবার সময় আমরা সঙ্গে এনেছিলাম নানা ধরনের কাঁচ আর পুঁতির মালা, জমকালো পোশাক আর আতসবাজী। সর্দার সেগুলো উপহার পেয়ে মহা খুশী। সর্দারের নাম সিরোন। সে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে তার কুটিরের কাছাকাছিই বেশ বড়সড় একটা কুটিরে। আমাদের দেখাশোনা, ফাইফরমাস খাটার জন্যে একজন লোকও পাঠিয়েছে, তার নাম টিয়ানু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এই আদিরাসী সম্প্রদায়টি খুবই শান্তিপ্রিয় এবং অতিথিবৎসল। সর্দারের মুখে তো হাসি সব সময় লেগেই আছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—এরা অলঙ্কার পরতে খুব ভালবাসে। হাড়, পাখির পালক, কিংবা বুনো ফুলের সাজে নারী পুরুষ সকলেই সেজে থাকে। এই সঙ্গে সারা শরীরে এঁকে রাখে নানা ধরনের উলকি। গ্রাহাম বললেন, শরীরে

উলকি কাটার প্রবণতা প্রায় সব আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে অল্প-বিস্তর দেখা যায়।

আপাতত কুটিরে আমি একা। মোমবাতির আলোয় বসে ডাইরি লিখছি। গ্রাহাম আর সত্যপ্রকাশ গেছেন সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে। এখনও ফেরেন নি।

আজকের মতো ডাইরি বন্ধ করলাম।

১৯শে নভেম্বর ঃ

ওবরু দ্বীপে এসেছি, দিন চারেক কেটে গেছে। এর মধ্যে 'সাদা দৈত্য'-রহস্যভেদের কতটা এগিয়েছে বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, জায়গাটা আমার ভালো লেগে গেছে। থাকি শহর কলকাতায় ঘিঞ্জি এলাকায়, চাকরি করি একঘেয়ে দশটা-পাঁচটা। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসে সেসব যেন দুঃস্বপ্ন বলেই ভাবতে ইচ্ছে করছে। কত রকম গাছ-গাছালি, কত রঙ-বেরঙের পাখী। বাইরের পৃথিবীটা এত সুন্দর জানা ছিল না। ওবরু দ্বীপটা আকারে অর্ধচন্দ্রের মতো বলা যায়। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের ওপর গভীর বন।

এই কয়েকটি দিন ডক্টর গ্রাহাম আর স্যার সত্যপ্রকাশ দেখলাম, জংলী আদিবাসী আর সর্দারের সঙ্গে মিশে কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দিলেন—সম্ভবতঃ অনুসন্ধান শুরুর পূর্বে সাদা দৈত্য সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহের মতলবেই।

আমি কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। সকাল-বিকেল ঘুরে বেড়াচ্ছি ওই আশ্চর্য-সুন্দর প্রকৃতির রাজ্যে। আমায় নিত্য-নতুন গাছ-পাতা আর পাখী চেনাবার ভার নিয়েছে সর্দারের পাঠানো সেই লোক যার নাম টিয়ান্নু। এ লোকটিও বেশ।

২০শে নভেম্বর ঃ

এ দ্বীপে এসে যে জিনিসটা আমার সব থেকে ভালো লাগছে,

তা হল এখানকার আদিবাসীদের মন মেজাজ। হিংসা, রক্তপাত এখানে নেই। যে যার আনন্দে কাজ করে। এমন কি সর্দার সিরোনের মধ্যেও প্রভুত্ব লিপ্সার বাড়াবাড়ি কিছু চোখে পড়ছে না। জংলী আদিবাসীদের মধ্যে এ চেতনাবোধ এল কী করে ভেবে অবাক লাগছে। টিয়ান্নুর কাছ থেকে ব্যাপারটা আজ বোঝবার চেষ্টা করলাম। ও শুধুমাত্র দূর পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সসম্মানে মাথা নীচু করে একটা কথাই বললো—'হেইল তিহান্নুক!' মানেটা প্রথমে বুঝতে পারি নি, তবে কুটিরে ফিরে এসে গ্রাহামকে জিজ্ঞেস করতে উনি জানিয়েছেন—স্থানীয় ভাষায় ওই কথাটার অর্থ 'সম্মানীয় সাদা দৈত্য'! এখানে এসে আদিবাসীদের কাছে আরো কয়েকবার শুনেছি এ শব্দটা।

আর একটা জিনিস খুব আশ্চর্য লাগল। এখানকার প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর বাঁ হাতে একটা বিশেষ উলকি আছে। উলকির ছবিটা বড় অদ্ভুত। একটা মানুষের দু-কাঁধে দুটি ডানা। টিয়ান্নুকে ওই উলকি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই ও একইভাবে মাথা নীচু করে শুধু বললো —'হেইল তিহান্নুক।' তার মানে উলকিটিই কি ওদের সেই সাদা দৈত্যের ছবি? ডানা দুটো বাদ দিলে তা কিন্তু মোটেই কোন দেবতা বা দৈত্যের ছবি বলে মনে হয় না। বরং একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে কোট প্যান্ট পরা একটি মানুষ হিসেবে ভেবে নিতেই ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্যের পরনে কোর্ট-প্যান্ট! কল্পনাটা ফ্যানটাসিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

২১শে নভেম্বর:

আজ সন্ধ্যাবেলা কুটিরে ঢুকে দেখি, সত্যপ্রকাশ আর গ্রাহাম এককোণে নীচু বেদীটার ওপর বসে। মোমবাতির আলোয় বেদীর ওপর কী একটা রেখে গভীর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা।

আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সত্যপ্রকাশ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—এই যে, এসে গেছ। শোন, কাল খুব ভোরেই তৈরী হয়ে

নেবে। আমরা একসঙ্গে বেরোব।

আমি বলতে যাব, "কোথায় ?" তার আগেই গ্রাহাম রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, হেইল তিহান্নুক আমাদের চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শুনে চমকে উঠলাম। সত্যপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, উনিও আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন।

কিছুক্ষণ দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বললাম, হেইল তিহান্নুক অর্থাৎ ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য ? তিনি আপনাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন ?

আমার মুখের অবস্থা দেখে এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন গ্রাহাম। স্যার সত্যপ্রকাশ কিন্তু আর হাসলেন না, বরং আমার হতচকিত ভাব লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে বললেন,—তুমি তো জানো, এই কয়েকটা দিন আমরা দিবারাত্র চেষ্টা চালিয়েছি এ দ্বীপের সাদা দৈত্যের আরো ইতিহাস সংগ্রহ করতে। কিন্তু সে এক মহাঝামেলার ব্যাপার। সাদা দৈত্যের কথা জিগ্যেস করলেই ওরা শুধু সসম্মানে 'হেইল তিহান্নুক' ছাড়া আর কিছু বলে না। অবশেষে সর্দারের কাছ থেকে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যেটুকু জেনেছি তা হল : বর্তমান সর্দারের বাবার আমলে এই সাদা দৈত্য নাকি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। ওদের রেড ইণ্ডিয়ান প্রাচীন উপকথায় নাকি ভবিষ্যতে সাদা দেবতার আবির্ভাবের কথা আছে। (প্রসঙ্গতঃ আমার মনে পড়ল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী। কলম্বাস যখন প্রথম আমেরিকা মহাদেশে পা দিয়েছিলেন, ওখানকার আদিম অধিবাসীরা নাকি তাঁকে প্রথমে আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতা মনে করেছিল)। যাই হোক, এখানকার সেই সাদা দৈত্য নাকি বাস করেন দ্বীপের উত্তরে ওই খাড়াই পর্বত, প্রাচীরের ওপরে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে। সর্দারের অধিকার আছে মাসে একবার এক বিশেষ দিনে পাহাড়ের কোন এক নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে সাদা দৈত্যের দৈববাণী শোনার।

দৈববাণী!—আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ। কথাটা আমিও প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর সর্দার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে। উত্তর পাহাড়ের অরণ্য উপত্যকায় বিরাট এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ মুখের কাছে সর্দার গিয়ে 'হেইল তিহান্নুক' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়। তখন সেই গুহার অন্ধকার থেকে ভেসে আসে সাদা দৈত্যের দৈববাণী। কোন জটিল সমস্যার সমাধান কিংবা কারুর দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্যে সর্দারকে উপদেশ এবং ওষুধ প্রদান করেন ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য, সেই সঙ্গে সর্দারকে জানিয়ে দেন তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনের তালিকা।

কিন্তু তাঁকে না দেখে তাঁর সঙ্গে এসব জিনিসের আদান-প্রদান হয় কী করে?—আমি জিগ্যেস না করে পারি না।

সে আর আশ্চর্য কী।—এবার গ্রাহাম বললেন, সাদা দৈত্যের কথা মতো পরদিন আবার ঠিক সময়ে সর্দার গিয়ে গুহা মুখে যা রাখার রেখে যা নিয়ে আসার নিয়ে আসে।

কিন্তু সেই মহান সাদা দৈত্য আমাদের চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ব্যাপারটা অতি কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে না?—আমার কথার ভঙ্গীর মধ্যে বোধহয় শ্লেষটুকু আর চাপা থাকে না।

মোটেই না, তাহলে 'ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন' কথাটা লেখা হত না স্বপন।—সত্যপ্রকাশ একটুও অধৈর্য না হয়ে বললেন, ওদের ভাষার 'হেইল তিহান্নুক'-এর চিঠিটা আমার কাছেই রয়েছে। তা তোমায় এক্ষুনি দেখাব। কিন্তু তার আগে চিঠিটা হাতে পেলাম কী করে, তা বলে নিই।

—হ্যাঁ বলুন, শুনি।

স্যার সত্যপ্রকাশ ঘটনাটা বললেন। সে ঘটনায় ঘনঘটা কিছু নেই। কদিন বাদে আজই বিকেলে সত্যপ্রকাশ আর গ্রাহাম মোটরলঞ্চে গিয়েছিলেন খালাসী দুজনের খবর নিতে। সমুদ্রের ধারে একটা ফাঁড়ির মধ্যে ডিক আর জিম আমাদের নির্দেশ মতো

লঞ্চ পাহারা দিচ্ছিল।

সত্যপ্রকাশ আর গ্রাহাম মোটরলঞ্চে উঠে ওদের সঙ্গে দেখা করতে ওরা একটা চিঠি এনে দিল। চিঠিটা নাকি গতকাল রাতের অন্ধকারে কেউ ওদের অলক্ষ্যে এসে লঞ্চের ডেকের ওপর রেলিংয়ে জংলী লতা দিয়ে বেঁধে রেখে যায়! সকালবেলা চিঠিটা পেয়ে ওরা ওটা কী ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে সারাদিন ভেবেছে।

চিঠি পাবার ব্যাপারটা বলে সত্যপ্রকাশ এবার একটা খসখসে তুলোট কাগজের চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

চিঠিটা সত্যিই বড় অদ্ভুত। এর কাগজ, কালি সবই কেমন যেন আনাড়ি ধরনের। চিঠিতে কয়েকটি মাত্র কথা ইংরাজীতে লেখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

"প্রিয় সভ্য পৃথিবীর মানুষ,

আপনাদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ নিয়ে আমি দিন গুণছি। চিঠির নীচে পথ-নির্দেশ দিলাম।

শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি—

আপনাদের বিশ্বস্ত

ডঃ এরিক সায়েরব্রক"

চিঠির নীচে দেখলাম একটা স্কেচ ম্যাপ আঁকা। আমাদের কুটিরের সামনে থেকে উত্তরের অরণ্য-পর্বতে পত্রদাতার বাসস্থানে যাবার পথ-নির্দেশ নিখুঁতভাবে দেওয়া রয়েছে।

ডঃ এরিক সায়েরব্রক! নামটা তো কোন জংলী দৈত্য-দানবের বলে মনে হচ্ছে না!—চিঠিটা সত্যপ্রকাশের হাতে ফেরত দিয়ে বলি।

একেবারে খাঁটি জার্মান নাম। আমার স্বজাতি—গ্রাহাম উঠে পাইচারি করতে করতে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানকার জংলী আদিবাসীরা এঁকেই 'হেইল তিহানুক' সম্বোধন করে।

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছি, তার আগেই গ্রাহাম ফের বললেন, ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য-রহস্যের সমাধান আশা করি খুব শীগ্‌গিরই আমরা করতে পারব।



—আচ্ছা, চিঠিটা কোন কারসাজি নয় তো? মানে আমাদের বোকা বানানোর জন্যে অন্য কেউ...

এটা কি তুমি পিরামিড-সিরিজের গোয়েন্দা রহস্য মনে করছ নাকি?—এবার স্যার সত্যপ্রকাশ আমায় দাবড়ে উঠে বললেন, ইংরেজীতে এ ধরনের চিঠি লিখে বোকা বানাবার লোক আছে কোথায় এ দ্বীপে? আমাদের খালাসী দুজনও তো ক অক্ষর গো মাংস! তাই বলছিলাম, কাল ঠিক সকালেই আমাদের অভিযান শুরু হবে। তুমি যেন আবার সে সময় একা-একা প্রকৃতিদর্শনে বেরিয়ে যেও না।

এ কথার জবাব না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, তাই চুপ করে রইলাম।

এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাচ্ছি। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

ডাইরি লিখতে বসেছি ওবরু দ্বীপের উত্তরে অরণ্য পাহাড়ের সেই জায়গায়, যেখানে নাকি প্রতি মাসের এক নির্দিষ্ট দিনে জংলী সর্দার এসে ওদের সাদা দৈত্যর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

ডক্টর গ্রাহাম, স্যার সত্যপ্রকাশ আর আমি আজ খুব ভোরে কুটিরে ব্রেকফাস্ট সেরে যাত্রা শুরু করেছি। সঙ্গে নেওয়া হয়েছে কিছু শুকনো খাবার, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর, টর্চ, ওয়াটার বটল আর গ্রাহামের ·২২ রাইফেলটা।

ম্যাপের নির্দেশমতো চলেছি। মনে হচ্ছে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, তবে স্বস্তির কথা, আবহাওয়া পরিষ্কার।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর অরণ্য-পাহাড় শুরু হয়েছে। কঠিন চড়াই পথ। সত্যপ্রকাশ এই বৃদ্ধ বয়সেও যে কতটা মজবুত, তা টের পাচ্ছি তাঁর লাফিয়ে লাফিয়ে পাথর ডিঙানো দেখে।

এই ভাবে আরো কয়েক ঘণ্টা চলার পর বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা এসে হাজির হয়েছি এই 'দৈববাণী সুড়ঙ্গ'র সামনে! হাতের ম্যাপ নির্দেশ করছে এই গুহার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

অন্ধকার গুহা। বাইরে থেকে টর্চ মেরে দেখা গেছে, যত দূর আলো যায় গুহার পথ ভেতরে চলে গেছে।

গুহায় প্রবেশের আগে বাইরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির সামনে বসে আমরা দুপুরের খাওয়াটা সেরে এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

একটা জিনিস কিন্তু এইসঙ্গে লক্ষ্য করছি, এ যাবৎ দ্বীপটার মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র প্রাণীর সন্ধান পাই নি। সমস্ত দ্বীপটাতেই যেন এক শান্তির পরিবেশ। ভারী ভালো লাগছে আমার। এখন শুধু জংলীদের সাদা দৈত্যের সঙ্গে নিরাপদে সাক্ষাৎকারটা ঘটলেই বাঁচি। ডক্টর সায়েরব্রক, যাঁকে জংলীরা আকাশ থেকে নেমে আসা সাদা দৈত্য বলে জানে, নাকি আসলে এক জার্মান। গ্রাহামের একথা যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই, তবে এ এক অস্বাভাবিক কাণ্ড বলতে হবে। সভ্য দুনিয়ার কোন মানুষ সভ্য পৃথিবী থেকে নিজেকে নির্বাসিত করে এই বর্বর জীবন কাটাচ্ছেন কোন উদ্দেশ্যে? এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছে যদি করতেন তিনি, এখানকার জংলীদের সহায়তায় তা নিশ্চয়ই একেবারে অসাধ্য হত না। তবে কি তাঁর এখানে এভাবে বাস করাটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়? এ যেন এক বিরাট প্রহেলিকা। হয়ত ডক্টর সায়েরব্রকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলেই সব রহস্যের সমাধান ঘটবে।

কিন্তু সাক্ষাৎকারের পরিণাম শুভ হবে তো?

২৩শে নভেম্বর: রাত নটা

রহস্যের সমাধান হয়েছে।

ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছে অবশেষে গত সন্ধ্যে নাগাদ। গ্রাহাম যা বলেছিলেন সঠিক—ডক্টর সায়েরব্রকই জঙলীদের সাদা দৈত্য। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় বিস্ময় এবং বিভীষিকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। সেই সঙ্গে এক মর্মস্পর্শী আলেখ্যও। কথা না বাড়িয়ে বরং আগাগোড়া ঘটনাটাই

সোজাসুজি লিখি।

দৈববাণী সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম গতকাল বিকেল চারটে নাগাদ। আগে আগে হাতে পাঁচ ব্যাটারি টর্চ জ্বেলে গ্রাহাম, পেছনে সত্যপ্রকাশ আর আমি।

সুড়ঙ্গের ভেতরটা অন্ধকার হলে কী হবে, পথ বেশ পরিষ্কার। মানুষের পদচিহ্ন যে এখানে পড়ে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মাইলখানেক দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে আমরা যেখানে এসে পৌঁছোলাম, সেটা অরণ্য পাহাড়ের অনেকটা ওপরে। চারপাশে নানা জাতের গাছপালা, বেশীর ভাগই পাইন আর ফার জাতীয় বৃক্ষ। সামনেই একটা বিরাট পাথরের চাঙড় সামনের পথটাকে প্রাচীরের মতো আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ হাতের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থেকে গ্রাহাম বললেন, ম্যাপের পথ-নির্দেশ এখানেই শেষ হয়ে গেছে, দেখছি। এর পর কী করণীয় ভাবুন।

কিন্তু আশেপাশে তো কোন জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না। শুধু সন্ধ্যের মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতাগুলো ঝিরঝির শব্দে কেঁপে চলেছে। এ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

রহস্যের পিছু ধাওয়া করে একেবারে কোথায় এসে হাজির হলাম আমরা ? তবে কি ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য আসলে কোন জীবিত মানুষ নয় ? এই দিনের আলোতেও গা-টা অজান্তেই ছম ছম করে উঠল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার জংলী কায়দায় এখান থেকে ডক্টর সায়েরব্রকের নাম ধরে হাঁক দিলে হয় না ? সাষ্টাঙ্গ অভিবাদনটা নাই বা করলাম।

কথাটা মনে ধরল ডক্টর গ্রাহামের। উনি হাত দুটো শঙ্খের মতো করে চীৎকার করে উঠলেন—ডক্টর সায়েরব্রক, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ?

আশ্চর্য ! উত্তর মিলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা ভরাট গম্ভীর স্বর ভেসে এল ওই বিরাট পাথরের চাঙড়টার পেছন থেকে : আমি

অপেক্ষা করে আছি সভ্য পৃথিবীর তিনজন মানুষকে আমার পর্বত-আবাসে অভ্যর্থনা করার জন্যে। আপনারা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবু আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবার আগে আমি একটি ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হতে চাই।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ওঁর এ অদ্ভুত কথার অর্থ কী ?

গ্রাহাম চীৎকার করে বললেন, আপনি কোন্ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চান ডক্টর সায়েরব্রক ?

আপনাদের আগে কথা দিতে হবে, আপনাদের সামনে যে হাজির হবে, তাকে দেখে আপনারা ভয় পাবেন না, ঘৃণা করবেন না অথবা পালিয়ে যাবেন না!—একটা করুণ আর্তির মতো ভেসে এল ডক্টর সায়েরব্রকের কণ্ঠস্বর।

গ্রাহাম সত্যপ্রকাশের মুখের দিকে তাকালেন। আমাদের তিনজনের চোখে-মুখেই বিভ্রান্তির ছায়া। হঠাৎ সত্যপ্রকাশ নৈঃশব্দ ভেঙে চীৎকার করে বললেন, ডক্টর সায়েরব্রক, আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল : পাথরের চাঙরের পাশে সঙ্কীর্ণ পথ আছে। সাবধানে ওটা পার হয়ে আসুন। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

সন্দেহ আমার অমূলক হয়নি। কিন্তু সত্য অতি কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

পাথর-প্রাচীরের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথটা অতিক্রম করে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছি আমরা।

প্রকৃতির বুকে তখন ম্লান অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। তবু দৃষ্টি তখনো রুদ্ধ হয়ে যায় নি। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে ও কে ?

মানুষের মতো অবয়ব, কিন্তু মানুষের শরীর কি অত বীভৎস হতে পারে ?

দৈর্ঘ্য প্রায় আঠারো ফুট, কলসীর মতো বিরাট মাথাটা, হাত-



পাগুলো মোটা মোটা থামের মতো। বিশাল পাহাড়ের মতো শরীরটা পথের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। পরণে অতি স্বল্প পরিচ্ছদ—গাছের বাকল আর লতাপাতায় তৈরী।

ওই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দিকে কতক্ষণ যে আমরা স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না, গ্রাহামের ফিসফিস কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল, উনিই ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য।

স্যার সত্যপ্রকাশ কিন্তু ইতিমধ্যেই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছেন। ডক্টর গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু আগে আমাদের দেওয়া কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি আমরা। চলুন আমরা এগিয়ে যাই।

আমাদের এগোতে দেখে সামনে দৈত্যাকৃতি মানুষটাও এগিয়ে আসতে লাগল।

ক্রমেই দূরত্ব কমছে আমাদের মধ্যে। মানুষটার সামনা-সামনি হতেই আর একবার আঁতকে উঠলাম, মানুষটার চেহারাটা শুধু বিশালই নয়, অত্যন্ত কুৎসিত।

আঠারো ফুট লম্বা বিশাল দেহে একটাও লোম নেই। প্রকাণ্ড জালার মতো মুখমণ্ডলে চোখ, নাক, ঠোঁট সবটাই ঢেকে রয়েছে চর্বির পাহাড়ে। থলথলে ফুলো ফুলো হাত-পা, কিন্তু গায়ের রঙটা এখানকার জংলীদের মতো নয়, ইউরোপিয়ানদের মতোই সাদা।

কিছুক্ষণ অনড় দৃষ্টিতে আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ওই বিশাল আশ্চর্য ভয়ঙ্কর মানুষটা নীচু হয়ে তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে পরিষ্কার ইংরাজীতে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, আমিই ডক্টর এরিক সায়েরব্রক। আমার পর্বত-আবাসে আপনাদের স্বাগতম জানাই।

আজই সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডক্টর সায়েরব্রক শোনালেন তাঁর আশ্চর্য জীবন-উপাখ্যান। ব্রেকফাস্টের আয়োজনে ছিল এখানকার এক বিশেষ জাতীয় কলা, ডাক্তারের নিজের হাতে জমিতে ফলানো একধরনের যবের রুটি আর কফি জাতীয় এক নতুন

ধরনের পানীয়। ডাক্তার জানালেন, এ পাতা তিনি এখানকার জঙ্গলেই আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা তিনি জানেন না। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ডোনা'।

এর আগে খুব ভোরে উঠে আশপাশটা মোটামুটি ঘুরে এসেছি আমরা। পাহাড়ের ওপর বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে এটা একটা মালভূমি অঞ্চল। ডাক্তার নিজে বাস করেন এক বড়সড় পাহাড়ী গুহার মধ্যে। গুহাটির অবস্থান এত সুরক্ষিত যে, সেখানে জল-ঝড় কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আক্রমণ ঘটতে পারে না। এছাড়াও সুরক্ষার আরো কিছু কিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছেন তিনি। পাশের আর একটা গুহায় আছে ডাক্তারের কিছু পালিত পশু—খুবই নিরীহ জাতের। মালভূমি অঞ্চলের পাথুরে মাটিতে চায-আবাদও করেছেন ডঃ সায়েরব্রক। তার মধ্যে যবজাতীয় এক ধরনের শস্য এবং ডাক্তারের আবিষ্কৃত নতুন জাতের কফি পাতা 'ডোনা' আছে।

যতই দেখছি ততই বিস্ময় বেড়েছে এবং সব কিছুর মূলে যে আশ্চর্য রহস্যটা, তা জানবার জন্যে ক্রমেই অন্তরের ছটফটানি বেড়ে চলেছে।

সব থেকে আগে মনে যে প্রশ্নগুলি জাগে, তা হল—ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য ওরফে ডক্টর সায়েরব্রক মানুষটা আসলে কে? উনি কি সত্যিই এই পৃথিবীর লোক? তাহলে ওঁর এই বীভৎস চেহারা হল কীভাবে। আর এখানে এই নির্জন অরণ্য-পাহাড়ে বছরের পর বছর নিজেকে উনি লুকিয়ে রেখেছেনই বা কেন? ওঁর সম্পর্কে প্রথম দর্শনের পর সেই ভয় আর গা-ঘিনঘিন ভাবটা কেটে গিয়ে এখন মনে জেগেছে দুরন্ত কৌতূহল। ডক্টর এরিক সায়েরব্রক আমাদের মনোভাব বুঝেই সম্ভবতঃ আমাদের কৌতূহল মেটাতে দেরি করেন নি। কিন্তু সমস্ত কাহিনীটা শোনার পর এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এমন ঘটনা কি সত্যিই সম্ভব? ভণিতা না করে কাহিনীটিই সংক্ষেপে লিখি।

গ্রাহাম ঠিকই অনুমান করেছিলেন, এরিক সায়েরব্রক জাতে একজন জার্মান। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে উনি বাস করতেন তৎকালীন নাৎসি জার্মানীর রাজধানী বার্লিন শহরে। বয়স তখন ওঁর অল্প হলেও ইতিমধ্যে চিকিৎসক হিসেবে খুবই সুনাম অর্জন করে ফেলেছেন। তাঁর ব্যবহার আর গুণপনার সুখ্যাতি শুধু জার্মান শহরে নয়, দূরবর্তী অনেক অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই নিত্য-দিন ভিড় লেগেই থাকত তাঁর চেম্বারে। সংসারটাও ছিল তাঁর খুব সুখের। থাকার মধ্যে ছিল স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে ডোনা। দিন রাত রুগীর পরিচর্যা করে আর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনগুলি।

এসময় হঠাৎ যুদ্ধ লাগল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর ডিক্‌টেটর নাৎসি বাহিনীর নায়ক হিটলার একের পর এক প্রতিবেশী রাজ্য গ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন জার্মানীর অভ্যন্তরে ভয়াবহ ইহুদি-নিধন যজ্ঞ। হিমলার, গোয়েবলস ইত্যাদি নাৎসি সহযোগীদের পরিকল্পনা ও প্ররোচনায় জার্মান রাষ্ট্র থেকে ইহুদি-বিতাড়ন এবং ইহুদি-হত্যার নিত্য-নতুন নিষ্ঠুর পদ্ধতি বার করতে লাগলেন তিনি। সারা জার্মানীতে তখন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস 'গোস্টাপা' বাহিনীর দেশব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডব। ডক্টর সায়েরব্রক তীব্র বিরোধিতা করলেন এই ইহুদি-নিধন কর্মসূচীর। জাতের বিচারে মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার শুধু অমানবিক নয়, বর্বরতা! কিন্তু জার্মান গোস্টাপা বাহিনী শীঘ্রই তাঁর ওপর শোধ নিল। এক রাতে কয়েকজন ইহুদি নারী আর শিশুকে আশ্রয় দেবার অপরাধে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা প্রবল তাণ্ডব চালাল তাঁর বাড়ি ঢুকে। ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকেও ধরে নিয়ে গেল ওরা ডাক্তারের প্রতিবাদের শাস্তি-স্বরূপ। কন্যা ডোনাকে বুকে তুলে কোন রকমে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচলেন ডাক্তার।

কদিন গোপনে খোঁজ করেও স্ত্রীর কোন সন্ধান পেলেন না তিনি। গোস্টাপা বাহিনীর লোকেরা তখন তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হিংস্র

নেকড়ের মতো। অবশেষে অতিকষ্টে জার্মানীর সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে ঢুকলেন তিনি। সেখানে একটা প্লেনে কয়েকজন ইহুদি বন্ধুর সঙ্গে পাড়ি দিলেন আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর ছায়াসঙ্গী!

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্লেন হঠাৎ ভেঙে পড়ল আটলান্টিক মহাসাগরেই এক জন-মানবহীন ছোট্ট দ্বীপে।

যাত্রীদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে রইলেন ডক্টর সায়েরব্রকই একা। এমনকি একমাত্র কন্যা ডোনাও হারিয়ে গেল জীবন থেকে।

কিছুক্ষণ সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলেন ডক্টর সায়েরব্রক। তারপর নিজের হাতে দগ্ধ এবং অর্ধদগ্ধ যাত্রীদের কবর দিয়ে সমস্ত শোক আর অবসাদ কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য মানসিক শক্তি তাঁর। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে যে মাথা উঁচু করে লড়তে পারে, সে-ই তো মানুষ!

ছোট্ট দ্বীপটা একদিনের মধ্যেই ঘুরে শেষ করে ফেললেন ডাক্তার। প্লেনের মিটার, কম্পাস আর কিছু কিছু যন্ত্রপাতি কাজ করছে তখনও। ডাক্তার বুঝলেন, দ্বীপটা আমেরিকার মূল ভূভাগ থেকে বেশ কয়েকশো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আটলান্টিক সাগরের এক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য দ্বীপের পরিবেশটি। গাছ-পালা খুবই কম। যা আছে, তাও কেমন ফ্যাকাসে, বিবর্ণ। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেও যে এখানে গভীর অরণ্য ছিল সে প্রমাণ চারপাশে ছড়ানো রয়েছে।

দ্বীপে পশু-পাখিগুলোও রাতারাতি দ্বীপ ছেড়ে পালিয়েছে নাকি? আশ্চর্য! কয়েক দিনের মধ্যে একটা পাখী পর্যন্ত উড়তে দেখলেন না ডক্টর সায়েরব্রক!

দ্বীপের প্রাণীর সন্ধান পেলেন ডক্টর সায়েরব্রক আরো দিন কয়েক পরে। গত কয়েক দিন সঙ্গের শুকনো খাবারেই পেট ভরিয়েছেন তিনি। কিন্তু এভাবেই বা কদিন চলবে? খাবারের ভাণ্ডার আর খুব বেশী নেই। অতএব সঙ্গে আনা রাইফেলটা নিয়ে একটু দূরের

দিকেই পা বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার।

পথে প্রাণীটিকে দেখতে পেলেন। একটা খরগোশ। কিন্তু চিনতে প্রথমটা কষ্ট হল। ওর চেহারাটাই কেমন বদলে গেছে। কোন খরগোশ কি ভেড়ার আকার ধারণ করতে পারে? কিন্তু চেহারা বদলালেও ওর স্বভাব বদলায় নি! ছুটে সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল। অবাক হলেন ডক্টর সায়েরব্রক। কিন্তু নিজের চোখ ছুটিকে অস্বীকার করেন কী করে? তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, ওটা খরগোশই, বিরাট আকার সত্ত্বেও ভেড়া বা অন্য কোন জানোয়ার নিশ্চয়ই নয়। ছু-একদিনের মধ্যেই আরো দেখলেন ডক্টর সায়েরব্রক। এ দ্বীপে যে কটা প্রাণী বেঁচে আছে, তাদের প্রত্যেকেরই আকার অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। ডাক্তার নিজেও কয়েকদিন যাবৎ একটা জিনিস বোধ করছেন। তা হল তাঁর নিজের শরীরের মধ্যে এক অদ্ভুত কম্পন, সেইসঙ্গে দিনভোর এক অজানা অস্বস্তি। শরীরটা কি হঠাৎ ভারী হয়ে যাচ্ছে তাঁর? নইলে এত সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন কেন? একাকিত্বের অবসাদই কি এর একমাত্র কারণ? দেহের নানা জায়গায় চামড়াও কেমন যেন ফেটে-ফেটে যাচ্ছে। নিজেকে ক্রমেই যেন আরো দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

এ সবের কারণ কী? এখানকার জলবায়ুর কি রাতারাতি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আগের দিন সকালে এখান থেকে কিছু দক্ষিণে একটা পাহাড়ের পাশের বিরাট গহ্বরটার কথা। পাহাড় ধসে ওটা যেন রাতারাতি হয়েছে, মনে হয়। অত্যন্ত গভীর। সেখানে যেতেই বাতাসে কিসের যেন একটা গন্ধ পেয়েছেন তিনি!

বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক সম্ভাবনা ঝলসে উঠল তাঁর মস্তিষ্কে, ছুটে গেলেন ভাঙা প্লেনটার মধ্যে।

বাতাসের তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের যন্ত্রটা তখনো অটুট আছে। কিন্তু সেখানে চোখ রেখে চমকে উঠলেন তিনি।

এখানকার বাতাস তেজস্ক্রিয়তায় ভরপুর।

নিশ্চয়ই এই দ্বীপের মাটিতে কিছুদিন আগে পৃথিবীর কোন তথাকথিত শক্তিধর সভ্য দেশ আকাশ থেকে তেজস্ক্রিয় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিল। সে বোমা পড়েছে দ্বীপের দক্ষিণ পাহাড়ের কাছে, সৃষ্ট হয়েছে ওই বিশাল গহ্বর। আর সেই জন্যেই এখানকার বাতাস আর প্রকৃতি বদলে গেছে, ধ্বংস হয়েছে এখানকার প্রাণী আর উদ্ভিদ জগৎ। যে কটা বেঁচে আছে, ভয়ানক তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত সেগুলি।

তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ লেগেছে তাঁর দেহেও। দিনে দিনে চেহারা বদলে যাচ্ছে তাঁর। শরীরের আকার হচ্ছে বীভৎস রকমের বিশাল থেকে বিশালতর। দেহের সমস্ত লোম যাচ্ছে খসে। চর্বির পাহাড়ে ঢাকা পড়ছে নাক, মুখ, চোখ।

এ দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে। নইলে বাঁচার কোন পথ নেই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বাঁচার লড়াই লড়তে হবে—এ তাঁর জীবনের শিক্ষা।

কয়েক সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটা বড়সড় মজবুত কাঠের নৌকো তৈরি করে ভাঙা প্লেনের অবশিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে পাড়ি জমালেন ডক্টর সায়েরব্রক অজানার সন্ধানে।

কাহিনীর শেষটা বলেছিলেন ডক্টর সায়েরব্রক দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর। গুহার সামনে মিষ্টি রোদে গা এলিয়ে বসে আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম।

সাতদিন-সাতরাত পরে নৌকো এসে ভিড়ল এই ওবরু দ্বীপের সমুদ্রতটে!

ক্ষিধেয়-তেষ্টায় ডাক্তার তখন অবসন্ন। তবু উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মৃত্যুর সঙ্গে অন্ততঃ শেষবারের মতো আর একটা পাঞ্জা কষবেন তিনি। এই নতুন দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে তিনি কিন্তু আশান্বিত হলেন। চারিদিক অরণ্য আর পর্বতে ঘেরা। প্রকৃতি এখানে মনোমুগ্ধকর। একটু দূরেই কলকল ছলছল শব্দে ঝরনা বয়ে চলেছে।

আঁজলা ভরে জলপান করে শরীরে কিছুটা বল পেলেন তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঝরনার জলে নিজের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি—কোন মানুষের চেহারা এত বীভৎস দানবীয় হতে পারে! বোবা যন্ত্রণায় মনটা টনটন করে ওঠে তাঁর।

হঠাৎ জংলী ঢাকের শব্দ। সামনের টিলাটার পাশে সমুদ্রের ধারে। টিলাটার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে যা দেখলেন ডক্টর, মনে হল, স্থানীয় জংলীরা কোন মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। তার একটু দূরে শোয়ানো রয়েছে একটি মৃতদেহ। খুব অল্প বয়সী ছেলে। তাকে ঘিরে কয়েক জন জংলী আদিবাসী নেচে নেচে শেষ অভিবাদন জানাচ্ছে। জংলীদের সর্দার দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু দূরে অধোবদনে, মৃত ছেলেটি হয়ত তারই। জংলীদের পুরোহিত দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে জাদুমন্ত্র আউড়ে চলেছে।

টিলাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। কতই বা হবে ছেলেটির বয়স। হয়ত ডোনার বয়সী। ডোনার কথা মনে পড়তেই বুকটা আবার টনটন করে উঠলো তাঁর।

মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, দেহটা যেন আশ্চর্য সজীব। কই, মৃত্যুর পাণ্ডুরতা তো ও শরীরে নেই!

বার্লিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মানবতাবাদী ডক্টর এরিক সায়েরব্রক যেন নিজের অজান্তেই সম্মোহিতের মতো গিয়ে হাজির হলেন মৃতদেহের কাছে।

তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব আর দানবীয় অবয়ব দেখে আতঙ্কিত হল জংলীরা, দুদ্দাড় করে ছুটে পালিয়ে গেল সামনের পাহাড়টার ওপরে। তারপর সেখান থেকে বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল এই সাদা দৈত্যের কাণ্ড-কারখানা।

ডাক্তার তখন মৃত ছেলেটির নাড়ি টিপতে শুরু করেছেন। ওর চোখ, জিভ, পেট, সারা শররী পরীক্ষা করে তিনি নিঃসংশয় হলেন,

ও মারা যায় নি ; কোন কারণে সাময়িক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে মাত্র।

বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ শাস্ত্র-সম্মত প্রক্রিয়ায় ম্যাসাজ চালালেন ডাক্তার। এক সময় ছেলেটির হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আবার চালু হল—প্রাণস্পন্দন ফিরে পেয়ে উঠে বসল সে।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। আঃ! এ পৃথিবীতে আর একটা জীবন তিনি মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

কিন্তু ততক্ষণে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে সেই জংলী আদিবাসীদের মধ্যে যারা তাঁর চেহারা দেখে একটু আগেই ভয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল ; তাঁর হাতে মৃতের জীবন ফিরে পাওয়া দেখে ছুটে এসে কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। তারা ধরে নিল—স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সাদা দৈত্য তাদের সর্ব বিপদ-আপদের পরিত্রাতা হিসেবে।

কী আশ্চর্য সরল আর হৃদয়বান এই জংলী মানুষগুলো! ডক্টর সায়েরব্রক সেই মুহূর্তেই ভালবেসে ফেললেন ওবরু দ্বীপ আর তার সরল আদিম অধিবাসীদের।

সেদিনের জীবন-ফিরে পাওয়া কিশোর ছেলেটিই আজকের সর্দার সিরোন।

কিন্তু এভাবে ওদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের কারণ কী? গ্রাহাম জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর সায়েরব্রককে।

—কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথম কারণ আমার এই বীভৎস চেহারা ওরা বেশীদিন চোখের ওপর সহ্য করতে পারত না, এক সময়ে ঘৃণা জাগতই। তাছাড়া আমার তেজস্ক্রিয় শরীরের সংস্পর্শে ওদের অসুস্থ হয়ে পড়াটাও আশ্চর্য ছিল না। তাই সোজা উপায় ওদের চোখের আড়ালে দেবতা সেজেই নিজেকে রেখে দিয়েছি সারা জীবন। কিন্তু ওদের সঙ্গে সংযোগ আমি

কখনো ছিন্ন করি নি, সে তো আপনারা জানেন।

আর দ্বিতীয় কারণ? এবার সত্যপ্রকাশের প্রশ্ন।

—নির্জনে সবার চোখের আড়ালে বসে আমি এক গবেষণা চালাচ্ছি।

—গবেষণা!

—হ্যাঁ, তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ থেকে মানুষ অথবা প্রাণীজগৎকে মুক্ত করার জন্যে এক প্রকার ভেষজ ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি আমি। আমি জানি মানুষের আগামী সভ্যতার ইতিহাসেও এ ধরনের অভিশাপ আসবে বারবার যতদিন না মানুষ নিজের আদিম পশুবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে পারবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হবে এক জাতি এক রাষ্ট্রের!

শ্রদ্ধা-অবনত দৃষ্টিতে আমরা তাকিয়ে রইলাম ওই জীবন-সন্ধানী আশ্চর্য বৃদ্ধ মানুষটির দিকে।

উনি তখনো বলে চলেছেন, আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন, আমার গবেষণা খুব শীগ্‌গির সফল হতে চলেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছি নিজের শরীরের ওপর। আমার ভেষজ ওষুধের ক্রিয়াতেই আমার শরীরের তেজস্ক্রিয়তার বিষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে, হয়ত আরো কয়েকটি মাস লাগবে ওষুধটি পুরোপুরি কার্যকরী হতে। এতগুলো বছর যখন এত বিপর্যয়ের মধ্যেও বেঁচে থেকেছি, আরো কয়েকটি বছরও নিশ্চয়ই বাঁচব আমি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সায়েরব্রক বললেন, ওবরু দ্বীপের সাদা দৈত্য রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবেন আপনারা। শুধু একটা অনুরোধ করব, যদি রাখবেন কথা দেন।

বলুন!—সত্যপ্রকাশই উচ্চারণ করলেন।

—বছর খানেক বাদে আপনাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এখানে আসবেন। আমার আবিষ্কার তেজস্ক্রিয়তা-নিরাময়কারী সেই ওষুধের ফর্মূলা আমি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে এ জীবনের

কাজ শেষ করব! না হলে আমি বোধহয় মরেও শান্তি পাব না স্যার সত্যপ্রকাশ।

ডক্টর সায়েরব্রক!—সত্যপ্রকাশ ডাক্তারের হাতে হাত রাখলেন—বলছি, আপনিও ফিরে চলুন আমাদের সঙ্গে।

মুহূর্তে যেন আনমনা হয়ে গেলেন ডাক্তার।

—হ্যাঁ, ডক্টর সায়েরব্রক, আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব সসম্মানে—

গ্রাহামের কথা শেষ হল না, হঠাৎ শিশুর মতো হাহাকার করে উঠলেন সায়েরব্রক। বললেন, দয়া করে এ অনুরোধ আমায় করবেন না আপনারা। আমার প্রিয় জন্মভূমিকে আমি ভুলে থাকতে চাই, ভুলে যেতে চাই সেসব দিনের স্মৃতি। কী লাভ আমার সেখানে ফিরে? আমার স্ত্রী এরা, মেয়ে ডোনা—তারা তো আর আমার কাছে ফিরে আসবে না! সভ্যমদগর্বী মানুষ ধিক্ তোমাদের! আজও তোমরা পৃথিবী থেকে মুছিয়ে দিতে পার নি অকালে স্বজন হারানোর কান্না!

যন্ত্রণায় যেন দুমড়ে গেল ওই বিশাল শরীরটা।

একটু বাদে আবার মুখ তুললেন ডাক্তার। ঠোঁটের কোণে একচিলতে বিষণ্ণ হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললেন, আপনারা আমায় মাপ করবেন। সেসব পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও নিজেকে স্থির রাখতে পারি না।

এবার সত্যিই কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপটপ করে ঝরে পড়ল ওই আশ্চর্য ইস্পাত দৃঢ় মানুষটার দু চোখ বেয়ে!

২৫শে নভেম্বর : সকাল সাতটা

একটু আগে আমাদের মোটর লঞ্চটা যাত্রা করেছে ওবরু দ্বীপ থেকে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি, ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে সমস্ত দ্বীপটা। ফেরার পথে ডাক্তার নিজে সংক্ষিপ্ত পথে আমাদের

পৌঁছে দিয়ে গেছেন সমুদ্র ফাঁড়িতে মোটরলঞ্চের কাছে, গত কয়েকদিন আগে যে পথে এসে আমাদের উদ্দেশ্যে চিঠি রেখে গিয়েছিলেন তিনি।

বিদায়-লগ্নে আমাদের তিনজনেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমি তো চোখের জল সামলাতে পারি নি।

মোটরলঞ্চ স্টার্ট করতেই ডাক্তার তীরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলেছেন,—আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার ফর্মূলা সভ্য পৃথিবীর মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্যে।

আমরাও ডেকের ওপর থেকে হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম, একেবারে শেষ মুহূর্তে গ্রাহাম চীৎকার করে বলেছিলেন, ডক্টর সায়েরব্রক, কথা দিচ্ছি, আমি নিজে আবার আসব। সমস্ত পৃথিবীকে জানাব আপনার কথা।

॥ শেষ ॥